কিশোর কাহিনী সিরিজ

সর্প-রহস্য সুন্দরবনে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

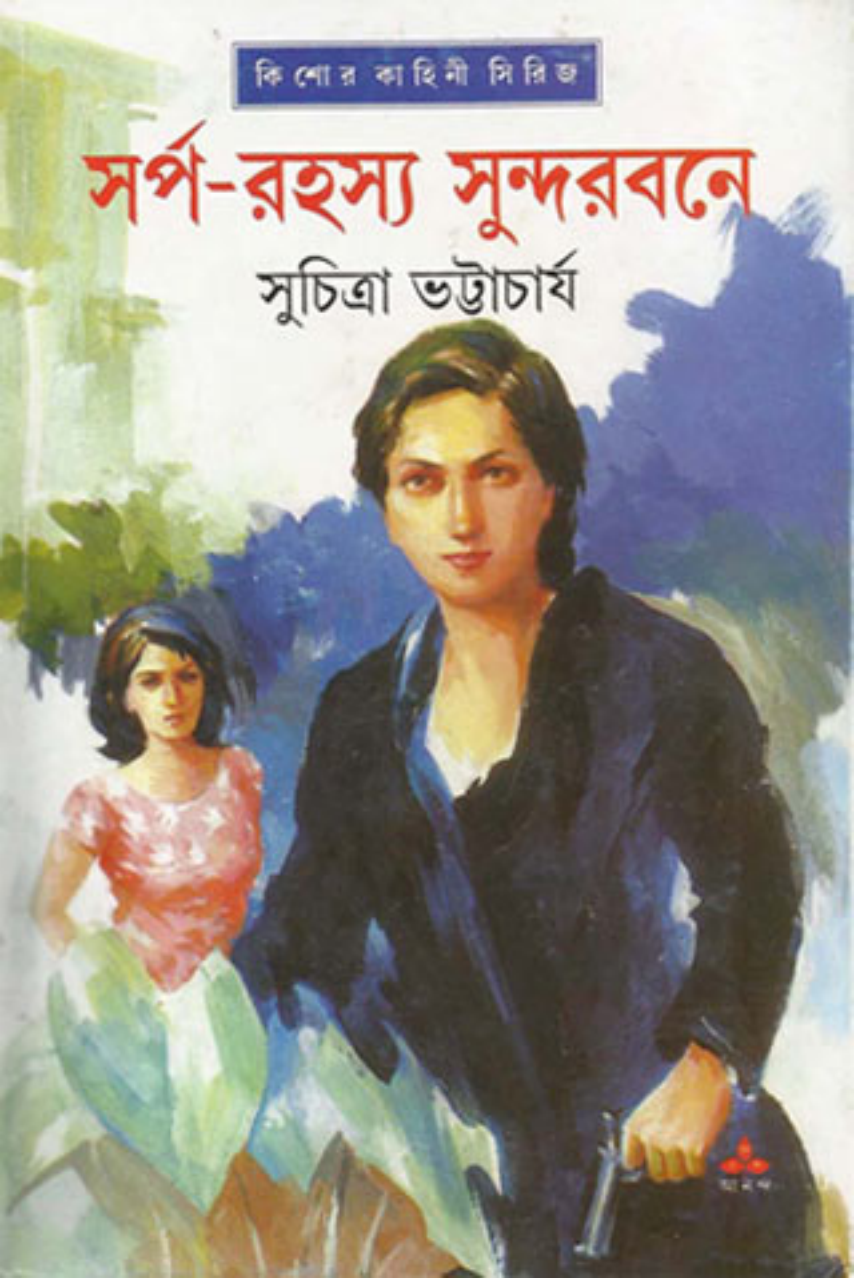

সর্প-রহস্য সুন্দরবনে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

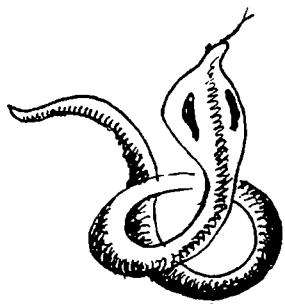

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অমিতাভ চন্দ্র

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৬
তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১২

© সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-554-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

SARPA-RAHASYA SUNDARBANE
[Juvenile Fiction]
by
Suchitra Bhattacharya

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

১০০০০

টুটান-জয়ন্তীর ছোট্ট মেয়ে
শরণ্যাকে—

"বুঝলি টুপুর, মানুষ নামের জীবটা এক্কেবারে ট্যাঁড়স," সোফায় বসে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে পার্থ আলগা মন্তব্য ছুড়ে দিল, "আমাদের এই গ্রহে মানুষের চেয়ে অপদার্থ জীব আর দু'টি মিলবে না!"

টুপুর ফোঁস করে উঠল, "ইস, বললেই হল! মানুষই জগতের সেরা প্রাণী।"

"কচু। মানুষ কী পারে? চিতাবাঘ বা হরিণের মতো দৌড়োনোর ক্ষমতা আছে মানুষের? নিদেনপক্ষে ঘোড়ার সঙ্গেও কি পাল্লা দিতে পারে? কুকুরের মতো ঘ্রাণশক্তি আছে? বাজপাখির মতো চোখ? বা সাইবেরিয়ান হাঁসদের মতো স্মৃতিশক্তি? কম সে-কম ছ'-সাত হাজার মাইল পথ কেমন নিখুঁতভাবে চিনে চিনে ওরা আকাশপথে পাড়ি জমায় ভাব! ঠিক একই জলায় এসে নামে। মানুষ তো দিকই ঠিক রাখতে পারবে না। বাঘ, সিংহ, হাতিদের মতো গায়ে জোর নেই, মাছদের মতো সাঁতার কাটতে পারে না, বিড়ালটিড়ালদের মতো অন্ধকারে দেখতে পায় না ...। পিঁপড়ে যে পিঁপড়ে, ওইটুকু একটা প্রাণী, তারও কিছু স্পেশাল ক্ষমতা আছে। বৃষ্টির গন্ধ টের পায়, ভূমিকম্প আসছে কিনা আগাম বুঝে ফ্যালে। আর মানুষ? সে সব ব্যাপারেই ক্যালাস। এই যে এত বড় একটা সুনামি হয়ে গেল, মানুষ আগে থেকে কিচ্ছুটি টের পেয়েছে?"

"সুনামির ব্যাপারটা কিন্তু পুরো ঠিক বললে না পার্থমেসো। আন্দামানের অনেক আদিবাসীই কিন্তু ভয়ংকর কিছু ঘটবে আন্দাজ করে পাহাড়টাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়েছিল।"

"সে তো সমুদ্র দূরে সরে যাচ্ছে দেখে ভয় পেয়ে। তাদের পূর্বপুরুষরা বলত, সমুদ্র উলটো দিকে ছুটলেই তোরা চোঁ-চাঁ পালাবি। সেটা মনে রেখেই তারা দৌড় লাগিয়েছে। নিজেদের কোনও ইন্দ্রিয় দিয়ে কি তারা সুনামির পূর্বাভাস পেয়েছিল?" পার্থ আয়েশ করে হেলান দিল সোফায়। বুড়ো আঙুল নেড়ে বলল, "মানুষের হয়ে তর্ক করিস না টুপুর। গোরুও ইচ্ছেমতো কান নাড়াতে পারে, মানুষের সেটুকু মুরোদও নেই। মানুষ একটা যাচ্ছেতাই রকমের দুর্বল ক্রিচার।

টুপুর কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ মেরে গেল। কাঁহাতক আর লড়বে পার্থমেসোর সঙ্গে! গত সোমবার থেকে টুপুরের স্কুলে গরমের ছুটি পড়েছে, পরশু বিকেলে তল্পিতল্পা গুছিয়ে টুপুর চলে এসেছে মিতিনমাসির বাড়ি। আর এ বাড়িতে পা রাখা ইস্তক অবিরাম গুণপনা শুনছে নানা জীবজন্তুর, পার্থমেসোর মুখে। কোত্থেকে একখানা ইয়া ঢাউস অ্যানিম্যাল কিংডমের বই জোগাড় করেছে মেসো, সকাল-সন্ধে সেই বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে, সঙ্গে চলেছে লম্বা লম্বা লেকচার। কাল রাতে কুমিরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। কুমির কেমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁ করে মড়ার মতো পড়ে থাকে, তারপর একগাদা পোকামাকড় মুখের ভিতর জমা হলে কেমন ঝুপ করে চোয়ালটা নামিয়ে দেয় ...। মানুষের নিন্দে অবশ্য আজই সকালে শুরু হয়েছে, কতক্ষণ চলবে কে জানে!

দু'হাতে দু'খানা জলখাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকেছে মিতিন। থালায় নারকোলের চাটনি আর সম্বর সহযোগে মশলা ধোসা। গত পুজোয় কেরল বেড়িয়ে ফেরার পর থেকে এ-বাড়িতে দক্ষিণী আহার চলছে খুব। মিক্সিতে চাল-ডাল বেটে প্রায়ই ইডলি বানানো হচ্ছে, সুজি দিয়ে উপমা, বাজার থেকে রেডিমেড ঘোল কিনে এনে ধোসা। একমাত্র ইডলিতেই যা একটু নাক সিঁটকোয় পার্থ, তবে

খেয়েও নেয়। আর ধোসা-উপমা-উত্থাপম হলে তো কথাই নেই, লুচির মতো উড়ে যায় ঝটপট।

প্লেট দুটো সেন্টার টেবিলে নামাতে নামাতে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "তোর মেসো এত হাউহাউ করছিল কেন রে টুপুর?"

"চেঁচাইনি তো।" পার্থ প্লেট টেনে নিল, "মানুষ যে অন্য প্রাণীর তুলনায় কত ইনফিরিয়র, সেটাই টুপুরকে ব্যাখ্যা করছিলাম।"

"কী রকম? আমিও একটু শুনি।"

"এই ধরো হাত-পা, চোখ-নাক-কান অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো মানুষ তো অ্যানিম্যালদের মতো করে ব্যবহার করতে পারে না ..."

"রং। পারে না নয়, করে না। প্রয়োজন হয় না। কারণ, তাদের একটি অঙ্গই বাকি সব অঙ্গের ঘাটতি পুষিয়ে দেয়।" মিতিন মাথায় আঙুল ঠুকল, "মগজ, মগজ। মগজ বলে বস্তুটি যে মানুষের সকলের চেয়ে স্ট্রং, এ কথাটা কি ভুলে গিয়েছ?"

"বোকো না। হাতির মাথায় মানুষের চেয়ে ঢের বেশি ঘিলু থাকে।" পার্থ সুড়ুৎ করে সম্বরে একটুখানি চুমুক মেরে নিল, "একটা বড়সড় হাতির মগজের ওজন জানো? ছ'কেজি। মানুষের সেখানে বড় জোর দেড় কিংবা পৌনে দুই।"

"ওভাবে হিসেব হয় না স্যার। দু'জনের শরীরের ওজনের অনুপাতটা ধরো। মানুষের ক্ষেত্রে বডি আর ঘিলু পঞ্চাশ ইজ টু এক। অর্থাৎ পঞ্চাশ কেজি মানুষের ঘিলু এক কেজি। আর হাতির বেলায় অনুপাতটা হাজারে এক। তিমি মাছের দশ হাজারে এক। শিম্পাঞ্জির দেড়শোয় এক। গোরিলার পাঁচশোয় এক। তুলনামূলকভাবে কার ঘিলুটা বেশি হল?"

"ঘিলুই কি সব? তোমার কথা মানতে গেলে তো বলতে হয়, মোটা মানুষের বুদ্ধি বেশি, রোগা মানুষের বুদ্ধি কম!"

"তা কেন? প্রোপোরশন তো দু'জনেরই মোটামুটি সমান।

আসলে কে কীভাবে ব্রেনটা ইউজ় করবে, তার উপরই নির্ভর করে কে বোকা আর কে চালাক।"

মিতিন বসে পড়েছে সোফায়। ভারতী আর-একখানা খাবারের প্লেট ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার হাতে। ধোসা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ঘুরে তাকাল টুপুরের দিকে, "জানিস তো, জীবজগতে একটা প্রাণী আছে, বুদ্ধিতে যে প্রায় মানুষের সমান-সমান।"

"কে?" পার্থ ফুট কাটল, "বাঁদর?"

"আজ্ঞে না। ডলফিন। একটা মানুষের সমান ওজনের কোনও ডলফিনের মস্তিষ্কের গ্রে-ম্যাটার মানুষের চেয়ে কম নয়। বরং সামান্য বেশিই। স্রেফ জলে থাকার অপরাধে বেচারারা আগুনের ব্যবহার শিখল না। ফলে মস্তিষ্কটাও মানুষের মতো কাজে লাগল না। ওরা যদি ডাঙায় বাস করত, তা হলে হয়তো ওরাই আজ রাজত্ব করত দুনিয়ায়। আর আমরা হতাম ডলফিনের আজ্ঞাবহ দাস। মানে ওদের পোষা জীব আর কী।"

টুপুর বলতে যাচ্ছিল, সে ভারী কিম্ভূত ব্যাপার হত তো তা হলে! তার আগেই টেলিফোনের ঝনঝন। পার্থ হাত বাড়িয়ে ফোনটা ধরতে গিয়েও থেমে গেল হঠাৎ। তেরচা চোখে বলল, "অ্যাই টুপুর, দ্যাখ তো কে! যদি আমায় খোঁজে, বলে দিবি মেসো এখনও বাজারে।"

"কেন?" মিতিনের চাউনি বক্র হল, "কাউকে মাল ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল বুঝি?"

"আর বোলো না, তিনটে পাগল লিট্‌ল ম্যাগাজিন বের করছে। রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা। আমায় ম্যাটার দিল পঁচিশে বৈশাখের পর। অথচ এখন চার বেলা করে আমার প্রেসে এসে তাড়া লাগাচ্ছে। ওদের তাগাদার ভয়ে আমি কাল দুপুর থেকে আর প্রেসই মাড়াইনি। সম্ভবত ওরাই এখন ..."

"ছি ছি, এভাবে পার্টিকে ঝোলাচ্ছ?"

"আমি কী করব? আমাকেও যে ডিটিপি-র লোকটা ঝুলিয়ে রেখেছে। কম্পোজ় করা ম্যাটার পেলে আমার আর ছাপতে কতক্ষণ। প্লেট বানাব আর মেশিনে চড়াব।"

"সব তোমার অজুহাত। তুমি মহা কুঁড়ে।"

মাসি-মেসোর বাদানুবাদের মাঝেই রিসিভার উঠিয়েছে টুপুর, "হ্যালো? কে বলছেন?"

ওপারে গমগমে কণ্ঠস্বর, "ম্যাডাম ... আই মিন মিতিন ... আই মিন প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায় আছেন কি?"

টুপুরের মুখ হাসিতে ভরে গেল, "আপনি নিশ্চয়ই অনিশ্চয় আঙ্কল?"

"তুমি টুপুর? ... তাই বলি, ম্যাডামের গলা তো এত সরু সরু নয়! ... কেমন আছ? কবে এলে মাসির বাড়ি? গরমের ছুটি পড়ে গেল? এবারও কি ভেকেশনটা মাসির বাড়িই কাটাচ্ছ? নাকি বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যানট্যান হচ্ছে?"

জবাবের প্রতীক্ষায় না থেকে পরের-পর প্রশ্ন হেনে চলেছেন অনিশ্চয়। উত্তর দেওয়ার আগেই পিছলে যাচ্ছে কোশ্চেন।

টুপুর ঢোক গিলে কোনওমতে বলল, "দেখি। ঠিক নেই কিছু।"

"তোমার মাসি কোথায়? কী করছেন?"

ধোসা খাচ্ছে, বলতে গিয়েও সামলে নিল টুপুর।

অনিশ্চয় অবশ্য থেমে নেই। পরের প্রশ্ন জুড়েছেন,"মাসিকে জিজ্ঞেস করো তো, উনি আজ হোল ডে ফ্রি আছেন কিনা?"

হাততিনেক দূরে বসেও অনিশ্চয়ের বাজখাঁই গলা কানে গিয়েছে মিতিনের। ইশারায় বলল, আছি।

উত্তর পেয়েই অনিশ্চয়ের ঘোষণা, "মাসিকে ইনফর্ম করে দাও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসছি। দরকার আছে।"

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে টুপুর নামিয়ে রাখল ফোনটা। কী এমন প্রয়োজন পড়ল যে, অনিশ্চয় মজুমদারের মতো উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার স্বয়ং ছুটে আসছেন মিতিনমাসির কাছে? গোয়েন্দা হিসেবে মিতিনমাসির খ্যাতি অবশ্য এখন কম নয়। এই তো গত মাসে ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির এক বড়সড় প্রতারণাচক্রকে পাকড়াও করেছে মিতিনমাসি। ভুয়ো ক্লেম দেখিয়ে বিমাসংস্থার লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করত দলটা। সরষের মধ্যে ভূত, অফিসের কিছু কর্মচারীও তাদের সঙ্গে জড়িত ছিল। একজন ডিভিশনাল ম্যানেজারও। খবরের কাগজে ফলাও করে বেরিয়েছিল সংবাদটা। সঙ্গে মিতিনমাসির নামও। পড়াশোনার চাপে সবসময় মিতিনমাসির শাগরেদি করা টুপুরের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে এই ছুটির সময় একটা কেস এসে গেলে ভালই হয়। অন্তত ছুটিটায় একটা রোমাঞ্চ তো থাকে। কিন্তু পুলিশের হোমরাচোমরারা কি প্রাইভেট ডিটেকটিভের হেল্প নেবেন? মনে হয়, অনিশ্চয় মজুমদার অন্য কোনও কাজে আসছেন।

মিতিনের আহার শেষ। চোখ সরু করে দেখছিল টুপুরকে। হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, "কী ভাবছিস?"

টুপুর সংবিতে ফিরল, "কিছু না তো।"

"অলস চিন্তায় সময় নষ্ট করিস না। কাজের কাজ কর। যা, চটপট গিয়ে আগে স্নানটা সেরে আয়।"

"এই সাতসকালে স্নান? সবে সওয়া ন'টা বাজে!"

"আমাদের বেরোতে হবে টুপুর।"

"সে কী? অনিশ্চয়বাবু যে আসবেন ...?"

"অনিশ্চয়বাবুর সঙ্গেই বেরোব।" বলেই মিতিনের নজর পার্থর দিকে, "আশা করি, তুমিও নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যাবে?"

"কোথায়?" পার্থর চোখ বড়বড়।

"সেটা অনিশ্চয়বাবু এলেই জানা যাবে।"

"উনি কি কোথাও যাওয়ার কথা বললেন?"

"মগজ খেলালে এটুকু আন্দাজ করে নেওয়াই যায়। যখন জিজ্ঞেস করেছেন সারাদিন ফ্রি আছি কিনা, তখন তো তার একটাই অর্থ। ওঁর সঙ্গে কোথাও বেরোতে হবে। নিশ্চয়ই একটা ওয়ার্কিং ডে-তে উনি এখানে আড্ডা মারতে আসছেন না!"

"হুম, তা বটে।"

"এবং জায়গাটাও সম্ভবত খুব কাছেপিঠে নয়। নইলে হোল ডে'র কথা বলতেন না।" মিতিন মিটিমিটি হাসছে। চোখ টিপে টুপুরকে বলল, "কী গো ঐন্দ্রিলাদেবী, লিট্‌ল ম্যাগাজ়িনের ছেলেগুলোর হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার এমন একটা সুযোগ তোমার মেসো কি ছেড়ে দেবে বলে মনে হয়?"

"বেড়ে বলেছ তো।" পার্থ গাল ছড়িয়ে হাসল, "অন্তত একটা দিন তো রক্ষে পাওয়া যাবে। অবশ্য যদি তোমার অনুমানগুলো অভ্রান্ত হয়।"

"বললাম যে, ব্রেনটাকে খেলাও। যত মস্তিষ্কের এক্সারসাইজ করবে, গ্রে-ম্যাটার তত পরিপুষ্ট হবে।"

"তাও ভাগ্যি বলোনি যে, পরিমাণে বাড়বে," পার্থ টিপ্পনি কাটল।

"উপহাস কোরো না। বাড়তেও পারে। তোমাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, আদিম মানুষের তুলনায় এখন আমাদের মগজ যথেষ্ট ওজনদার। প্রাচীন মানুষের ফসিল পাওয়া গিয়েছে আফ্রিকার রোডেশিয়ায়। এখন যে দেশটার নাম জ়িম্বাবোয়ে। প্রায় লক্ষ বছর আগেকার মানুষ। তার মগজের ওজন কত ছিল জানো?"

পার্থ ঠোঁট ওলটাল, "জানি। সওয়া কেজি।"

"প্রায় ঠিক বলেছ। টু বি এগ্‌জ্যাক্ট, তেরোশো গ্রাম। অর্থাৎ এখনকার মানুষের ব্রেনের চেয়ে না হোক আড়াইশো-তিনশো গ্রাম

কম। এই তফাতটা কিন্তু ঘটেছে মগজ নিয়ে কসরত করার কারণেই। ভবিষ্যতে এই ওজন যে দু'কিলোতে পৌঁছোবে না, এ-কথা হলফ করে বলা যায় কি?"

"বাপ্‌স, কী কথা থেকে কী কথা! এখন তোমার মজুমদারসাহেব এলে আমি বাঁচি।"

ভারতী চা এনেছে। টুপুর উঠে পড়ল। পাশের ঘরে এসে দেখল, কম্পিউটার অন করে ভিডিও গেম্‌স খেলছে বুমবুম। তার শুধু একটাই খেলা, রোড র‍্যাশ। সাত-সাতটা মোটরসাইকেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কী ভয়ংকর গতিতে যে নিজের মোটরসাইকেলটি ছোটায় সে! কি-বোর্ড টিপে-টিপে। শাঁইশুঁই করে একবার বাঁদিকে যায়, তো একবার ডানদিকে। উলটো দিক থেকে আসা গাড়িগুলোকে নিপুণভাবে পাশ কাটায়। সামনে কোনও পথচারী এসে পড়লে, ধাক্কা মেরে বেমালুম শুইয়ে দেয় তাকে। আরও যে কত অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাচ্ছে অহরহ! এই হয়তো কোনও ল্যাম্পপোস্টে গুঁতো মারল, পরক্ষণে গোত্তা খেল পাশের কোনও বাড়িতে। তাতেও এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই বুমবুমের। চাবি টিপে কেতরে যাওয়া মোটরসাইকেলকে খাড়া করে ফের দৌড় শুরু। প্রতিদ্বন্দ্বীরা কাছেপিঠে এসে গেলে তাদের আর রক্ষে নেই। বুমবুমের মোটরসাইকেলের চালক ক্যাঁত ক্যাঁত লাথি চালাবে। সত্যি কথা বলতে কী, রেস জেতার চেয়ে ওই লাথি চালানোতেই বুমবুমের আগ্রহ বেশি। গোটা পথটা যে কী তারস্বরে গর্জন করে আটখানা মোটরবাইক! টুপুরের তো পাগল-পাগল লাগে।

টুপুর হালকা ধমক দিল, "ভলিউমটা কমা না বুমবুম। কালা হয়ে যাবি যে!"

বুমবুম শুনতেই পেল না। এইমাত্র একটা দুর্ঘটনার জন্য পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে তাকে ধাওয়া করেছে, প্রাণপণে

মোটরসাইকেলের গতি বাড়াচ্ছে সে।

টুপুর গলা চড়াল, "কী রে, কথা কানে যাচ্ছে না? খেলা থামিয়ে খেয়ে নে। ধোসা তো চামড়া হয়ে গেল।"

এবারও জবাব নেই। চোখ জ্বলছে বুমবুমের। চোয়ালে চোয়াল কষে আঙুল চাপছে কি-বোর্ডে।

কাঁহাতক আর বুমবুমের পিছনে লেগে থাকা যায়! মিতিনমাসির কাছে ঝাড় না খাওয়া অবধি বুমবুমের চৈতন্য ফিরবে না। দুনিয়ায় একমাত্র মা ছাড়া আর সকলকেই উলটো ট্যাঁকে গোঁজে বুমবুম।

খুদে মাসতুতো ভাইটিকে জিভ ভেংচে টুপুর স্নানে ঢুকে গেল। বেরিয়ে সবে আয়নার সামনে চুল আঁচড়াচ্ছে, ডোর বেলে ডিং ডং।

পার্থমেসোর গলা শুনতে পেল টুপুর, "সুস্বাগতম মজুমদার সাহেব। অধমদের বাড়িতে বহু দিন পর আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।"

সোফার হাতলে দু'বাহু ছড়িয়ে বসেছেন অনিশ্চয়। তাঁর বিপুল দেহটি সিঙ্গল সোফায় আঁটছে না ভালমতো। কেমন যেন হাঁসফাঁস করছেন। পাখার নীচে বসেও ঘামছেন দরদর। আই পি এসের উর্দি নয়, অনিশ্চয়ের পরনে আজ ক্রিমরঙা ট্রাউজার আর লম্বা লম্বা স্ট্রাইপ টানা মেরুন বুশশার্ট। চওড়া কবজিতে বড়সড় ডায়ালের কোয়ার্টজ ঘড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। নিখুঁত কামানো গাল, সযত্নলালিত ঢেউ খেলানো পুরুষ্টু গোঁফটিতে পাক ধরেছে অল্প অল্প।

মিতিন ঠান্ডা জল এনে সামনে রেখেছিল। এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে পরিতৃপ্ত মুখে অনিশ্চয় বললেন, "আঃ, প্রাণ জুড়োল।"

মুখোমুখি ছোট সোফায় বসেছে মিতিন। জিজ্ঞেস করল, "কী খাবেন বলুন? চা? না কফি?"

মাঝের লম্বা সোফায় পার্থ আর টুপুর। পার্থ ফোড়ন কাটল, "সঙ্গে নিশ্চয়ই একটু স্ন্যাক্‌সও চলবে? এগ পকোড়া, কিংবা পেঁয়াজি?"

"ওরে বাবা, কিছু না। বাইরে এখনই টেম্পারেচার আটত্রিশ ডিগ্রি চড়ে গিয়েছে। উইথ নাইনটি পারসেন্ট হিউমিডিটি। এখন চাই স্রেফ জল। লিটার-লিটার জল।"

মিতিন হেসে বলল, "সে যত খুশি খান। একটু শরবত অন্তত বানিয়ে দিই?"

"বাজারের সিন্থেটিক স্কোয়াশ দিয়ে? রাম কহো। ঘরে বিশুদ্ধ পাতিলেবু আছে?"

"বেশ তো, নিম্বুপানিই দিচ্ছি। গরমে আপনার যা ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, নুন-চিনি-লেবুটাই আপনাকে সুট করবে।"

"নো চিনি। আমি চিনি ছেড়ে দিয়েছি।"

"বলেন কী? আই-জি সাহেবের সুগার ধরা পড়ল নাকি?"

"উঁহু। বাহান্ন বছর বয়স হল, এবার একটু ক্যালরি কনশাস না হলে চলে? শরীরে একগাদা ফ্যাট জমানো তো কাজের কথা নয়।"

"বটেই তো, বটেই তো," পার্থ মাথা দোলাল। মুচকি হেসে বলল, "তবে কিছু মনে করবেন না সাহেব, চোর-ডাকাতদের মুখে ছাই দিয়ে আপনার শরীরস্বাস্থ্যের আর-একটু শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে!"

"ঠাট্টা করছেন? কী সুখেই যে মুটোচ্ছি!" অনিশ্চয়ের গলায় খেদ ঝরে পড়ল, "রিসেন্টলি প্রোমোশনটা হয়ে কী বাম্বু যে খেলাম! আগে শুধু কলকাতার ক্রিমিনাল নিয়ে নাড়াঘাঁটা করতাম, এখন পুরো ওয়েস্টবেঙ্গল ঘাড়ে চেপেছে। রাতের ঘুমফুম আমার উবে গেছে

মশাই। কী টেনশন, কী টেনশন! সারারাত বিছানায় শুয়ে শুধু দুঃস্বপ্ন দেখি। আশ্চর্য ব্যাপার, টেনশন যত বাড়ছে, ভুঁড়িও তত বাড়ছে!"

মিতিন উঠে অন্দরে গিয়েছিল। ভারতীকে শরবত বানানোর নির্দেশ দিয়ে আবার এসে বসেছে।

কেজো গলায় বলল, "আজ টেনশন কী নিয়ে? হঠাৎ এই অভাজনের বাড়ি চড়াও হয়েছেন যে বড়?"

"একটা অড ঝামেলায় ফেঁসে গিয়েছি ম্যাডাম।"

"কীরকম?"

অনিশ্চয় দু'-এক সেকেন্ড চুপ। তারপর চোখ পিটপিট করে বললেন, "ডক্টর সুমন্ত্র সান্যালের নাম শুনেছেন?"

"বৈজ্ঞানিক সুমন্ত্র সান্যাল? বায়োসায়েন্টিস্ট?" মিতিনের ভুরু জড়ো হল, "পরশুর নিউজপেপারে যাঁর নিখোঁজ হওয়ার খবর বেরিয়েছিল?"

"জানতাম আপনার নজর এড়াবে না। ওই সুমন্ত্র সান্যালই আমার জান কয়লা করে দিচ্ছে।"

"তাঁকে খুঁজে বের করবার দায়িত্বটা সরাসরি আপনার ঘাড়েই চেপেছে নাকি?"

অনিশ্চয় আবার একটুক্ষণ নীরব। তারপর গলাঝাড়া দিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা তা হলে একটু ডিটেলে বলি। বৈজ্ঞানিক মহাশয়ের উবে যাওয়ার ঘটনাটার একটা উপক্রমণিকা আছে। সেটা অবশ্য এ কেসে রেলেভ্যান্ট হতেও পারে। আবার না-ও হতে পারে।" সামান্য দম নিলেন অনিশ্চয়, "ডক্টর সান্যাল নিঃসন্দেহে একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, তাঁকে আমি চিনতামও না, কস্মিনকালে নামও শুনিনি। তবে একটু পিকিউলিয়ারভাবে হপ্তাদুয়েক আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে। সরাসরি নয়, ওভার টেলিফোন।"

"সুমন্ত্র সান্যাল আপনাকে ফোন করেছিলেন? কেন?"

"ফর আ ভেরি পেটি রিজ়ন। এত সামান্য কারণে কোনও প্রজ্ঞাবান লোক যে গোয়েন্দা বিভাগের আই জি-কে ফোন করতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন। সান্যালমশাইয়ের একটা পোষা ডোবারম্যান ছিল। কুকুরটার দু'দিন ধরে ট্রেস নেই। তাতেই উতলা হয়ে ভদ্রলোক ..."

"স্ট্রেঞ্জ! ভদ্রলোক মিসিং হওয়ার আগে আগে কুকুরটা হারিয়ে গেল?" মিতিন নড়েচড়ে বসল, "আচ্ছা, উনি তো দেখলাম বাসন্তীতে থাকেন? আই মিন, থাকতেন। অত দূর থেকে একটা কুকুরের জন্য আপনাকে ...?"

"পিকিউলিয়ার কি সাধে বলছি। খ্যাপামোরও একটা লিমিট থাকে। ভাবুন আপনি, কোথায় সুন্দরবনের বাসন্তী আইল্যান্ড, আর কোথায় আমার আলিপুরের ভবানী ভবন! বৈজ্ঞানিকমশাই নাকি আগে লোকাল থানায় ডায়েরি করতে গেছিলেন। তারা বোধহয় সেভাবে পাত্তাটাত্তা দেয়নি। ব্যস, অমনই ডিরেক্টরি ঘেঁটে আমার নম্বর বের করে তাঁর সে কী কাকুতিমিনতি! কুকুরটা আমার প্রাণ ... কুকুরটা না থাকলে বড্ড হেল্‌পলেস ফিল করি ... মনে হচ্ছে এর পিছনে কোনও ফাউল-প্লে আছে ... কাইন্ডলি আপনারা আমার রজারকে উদ্ধার করে দিন ..."

"আপনি কি কোনও স্টেপ নিয়েছিলেন?"

"দুর, কুকুর খুঁজে বেড়ানো কি আমার কাজ! তবে সেদিন মুখের উপর কিছু বলিনি। যতই হোক, পোষা জীবজন্তুর উপর মানুষের তো একটা আলাদা দুর্বলতা থাকেই। তার উপর একজন বিজ্ঞানী মানুষ ... অত করে বলছেন ... টেলিফোনেও ওঁর স্বরটা সেদিন ভারী বিচলিত বলে মনে হচ্ছিল ...। ভদ্রলোককে নরম করেই বলেছিলাম, দেখছি কী করা যায়। ইনফ্যাক্ট, বাসন্তী থানার ও সি-কে এনকোয়্যারি

করার জন্য ইনস্ট্রাকশনও পাঠিয়েছিলাম। তারপর তো হাজার কাজের ভিড়ে ভুলেও গিয়েছি। হঠাৎ এই নতুন বিপত্তি। ডক্টর সান্যাল স্বয়ং হাপিশ। দুপুরে খেয়েদেয়ে কলকাতা যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন, তারপর থেকে আর নো ট্রেস।"

"মিসিং তো হয়েছেন দেখলাম গত শুক্রবার! তাই না?"

"পুলিশ খবর পেয়েছে সোমবার। আই মিন, থানায় ডায়েরি হওয়ার পর। সেদিনই আমাদের মিসিং পার্সন্‌স স্কোয়াডে রিপোর্ট এসে যায়। তারাই মিডিয়াকে ঘটনাটা জানিয়েছিল।"

"দু'দিন পর পুলিশে ডায়েরি হল কেন?"

"কে দেবে খবর! ফ্যামিলি তো এখানে নেই, উনি একাই থাকতেন। সঙ্গে শুধু একটি কাজের লোক। তা সে বোধহয় ভেবেছে, সুমন্ত্রবাবু কোথাও আটকা পড়েছেন, তাই এক-দু'দিন দেখে নিয়ে ...। ক্যালাস আর কী। আগে জানালে আরও আগে ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়ে যেত।"

"আচ্ছা এমন নয় তো, ডক্টর সান্যাল তাঁর ডোবারম্যানটির শোকেই বিবাগী হয়ে গিয়েছেন?" পার্থ পুটুস করে মন্তব্য ছুড়ল, "এতক্ষণে হয়তো তিনি হিমালয়ের পথে ..."

"ফাজলামি কোরো না তো।" মিতিন থামাল পার্থকে। অনিশ্চয়ের দিকে ফিরে বলল, "কিন্তু এর জন্য খোদ আপনি ছোটাছুটি করবেন কেন? আপনার আন্ডারে অফিসারের তো কমতি নেই!"

"দুঃখের কথা আর কী বলব!" অনিশ্চয় ফোঁস করে একটা দেড়মনি শ্বাস ফেললেন, "অ্যাকচুয়ালি এ কেস তো হ্যান্ডল করার কথা মিসিং পার্সন্‌স স্কোয়াডেরই। ওরা রুটিন-তদন্ত শুরুও করেছিল। কিন্তু কাল রাতে হঠাৎ হোম মিনিস্টারের ফোন এই কলুর বলদকে। দিল্লির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক ডক্টর সুমন্ত্র সান্যালের

অন্তর্ধানে নাকি ঘোরতর উদ্বিগ্ন। ডক্টর সান্যালের গবেষণার সঙ্গে তাদের নাকি কী সব যোগাযোগও আছে। তারা জানিয়েছে, রাজ্য সরকার ইমিডিয়েটলি ডক্টর সান্যালকে খুঁজে বের করতে না পারলে সি বি আই আসরে নামবে। ব্যস, আঁতে ঘা লেগে গিয়েছে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। এখন তাঁর হুকুম, আমি যেন সশরীরে বাসন্তী ঘুরে এসে তাঁকে রিপোর্ট দিই এবং সেটা আজই।"

"হুম। সুমন্ত্র সান্যাল তো তা হলে দেখছি বেশ উঁচুদরের সায়েন্টিস্ট!" পার্থ গম্ভীর সুরে বলল, "কিন্তু আমরা কখনও এঁর নাম শুনিনি কেন?"

"আমরা ক'টা বিজ্ঞানীর খবর রাখি!" মিতিন বলল, "প্রচারবিমুখ মানুষ হলে তো নাম জানবার সম্ভাবনা আরও কম।"

"তা ঠিক।" পার্থ মাথা দোলাল, "ডক্টর সান্যালের রিসার্চ-টপিকটা কী ছিল আই জি সাহেব?"

"ক্যান্সার।"

"ধ্যাড়ধেড়ে বাসন্তীতে বসে ক্যান্সারের ওপর গবেষণা? স্ট্রেঞ্জ!"

"শুনে আমিও প্রথমটা অবাক হয়েছিলাম। ইনফ্যাক্ট কৌতূহল নিরসন করতে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টরকে ফোনও করি। তিনিও নামী বিজ্ঞানী। ডক্টর রতনলাল চৌধুরী। রতনবাবুও দেখলাম সুমন্ত্র সান্যালকে বিলক্ষণ চেনেন। ওঁর মুখেই শুনলাম, ডক্টর সান্যালের গবেষণার নেচার নাকি একটু অন্য ধরনের। সাপের বিষ থেকে নাকি ক্যান্সারের ওষুধ বের করার চেষ্টা করছেন সুমন্ত্রবাবু। অর্থাৎ তাঁর গবেষণার র মেটিরিয়াল হল সাপ। সম্ভবত সেই কারণেই সুন্দরবনের মতো একটি সর্পসংকুল অঞ্চলকে তিনি বেছে নিয়েছেন।"

"সাপের বিষ থেকে ক্যান্সারের ওষুধ?"

"ডিরেক্টরসাহেব তো সেরকমই বললেন। তবে ডিটেলটা উনি

জানেন না। এবং এ-ও মনে হল, সুমন্ত্রবাবুর গবেষণার ধারায় ডক্টর চৌধুরীর খুব একটা আস্থা নেই। খানিকটা ব্যঙ্গ করেই বললেন, সর্পবিষ থেকে ক্যান্সার ড্রাগ বানানো সম্ভব হলে, ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্টরাই নাকি বিশ বছর আগে বের করে ফেলতেন! সঙ্গে আরও অনেক হাবিজাবি কমেন্ট। আমেরিকার নামী ল্যাবরেটরিতে নোবেল লরিয়েটদের সঙ্গে কাজ করে এসে গর্বে নাকি মাটিতে পা পড়ত না ডক্টর সান্যালের! এখানকার বিজ্ঞানীদের নাকি আমল দিতেন না, কারও সঙ্গে সেভাবে যোগাযোগ রাখতেন না ...। রতনবাবুর ধারণা, সুমন্ত্রবাবুর প্রোজেক্টটা বোধহয় ফেল মেরেছে। আর তাই উনি মুখ লুকোতে কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছেন! তলেতলে বন্দোবস্ত করে হয়তো ফের আমেরিকাতেই ভাগল্‌বা।"

"এভাবে বলে দিলেন?" পার্থ চোখ কুঁচকোল, "আপনার ওই ডিরেক্টরসাহেবটি তো মনে হচ্ছে মোটেই সুবিধের লোক নন!"

"অত সহজে দুয়ে-দুয়ে চার কোরো না।" মিতিন মাথা নাড়ল, "বিজ্ঞানীমহলে নানা ধরনের আকচাআকচি থাকে। চিন্তাভাবনায় না মিললে একজন অন্যজনকে নস্যাৎ করে দেন।"

"তার মানে প্রফেশনাল জেলাসি?"

"একরকম তাই। আর এই হিংসে তো সব লাইনেই আছে। বিজ্ঞান, খেলাধুলো, নাচ, গান, শিল্প, সাহিত্য ...। এই যে আমি দুটো-চারটে কেস সল্‌ভ করি, তাতে কি মজুমদারসাহেবের বুকে একটুও কাঁটা ফোটে না বলতে চাও?"

অনিশ্চয়ের লেবুর শরবত এসে গিয়েছে। তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিচ্ছিলেন গ্লাসে। আচমকা বিষম খেয়ে গেলেন। খুকখুক কাশছেন। সামলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ডিরেক্টর রতনলাল চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে আমি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছি। ডক্টর

সুমন্ত্র সান্যাল খুব একটা মিশুকে লোক নন। এবং নিরিবিলিতে একা-একা কাজ করাই তাঁর পছন্দ। অর্থাৎ গবেষণার ব্যাপারে একটু সিক্রেটিভ টাইপ।"

"আজকাল বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই তাই। কেউ নিজের গোপনীয়তা ফাঁস করতে চান না। ... তা ডক্টর সান্যাল আমেরিকা থেকে ফিরেছেন কবে? কেনই বা চলে এলেন?"

"এটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে ওসব ইনফর্মেশন জোগাড় করা পুলিশের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়," শরবত শেষ করে অনিশ্চয় গোঁফ মুছলেন, "আগে একবার সরেজমিন তো করে আসি।"

"যান। অল দ্য বেস্ট।"

"যদি অসুবিধে না থাকে, আপনিও যেতে পারেন সঙ্গে।"

টুপুরের হৃৎপিণ্ড তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। মিতিনমাসির ডিডাকশন কী নিখুঁত! ঠিক ধরে নিয়েছে যেতে হবে কোথাও। সুন্দরবনের বাসন্তী দ্বীপে রহস্য-রোমাঞ্চ মোড়া একটা দিন, নিখোঁজ এক বিজ্ঞানীর অনুসন্ধান ... ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কিন্তু তার মিতিনমাসির মুখ-চোখ হঠাৎ এমন নিস্পৃহ কেন? একটু আগে নিজেই তো বলল ...!

অনিশ্চয় আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কী, যাবেন তো?"

মিতিনের স্বর নিরুত্তাপ, "আমি গিয়ে কী করব? আপনি তদন্তে ব্যস্ত থাকবেন, আমার উপস্থিতিতে আপনার অসুবিধেই হবে।"

অনিশ্চয় যেন এরকম জবাব আশা করেননি। থতমত খেয়ে গিয়েছেন। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, "আহা, অত ফর্মাল ব্যাপার ভাবছেন কেন? ধরে নিন না, বেড়াতেই যাচ্ছেন।" বলতে বলতে পার্থ আর টুপুরকে একবার দেখে নিলেন অনিশ্চয়। হাসিহাসি মুখে বললেন, "টুপুরই বা মাসির বাড়ি এসে বসে থাকবে কেন, সেও

চলুক। সঙ্গে পার্থবাবুর মতো একজন উইটি লোকের কম্পানি পেলে তো আরও ভাল।"

মিতিনের স্বর তবু নীরস, "ওরা কি যাবে? দেখুন ওদের জিজ্ঞেস করে। পার্থ তো বলছিল প্রেসে কী সব জরুরি কাজ আছে ..."

"কাজ একদিন তোলা থাক। আজ সকলে আমার সঙ্গে গাড়িতে করে ... কী ফাইন একটা ওয়ান ডে ট্রিপ ..."

মিতিনমাসিটা কী প্যাঁচোয়া রে বাবা! টুপুরের পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল। নিজে থেকে পার্থমেসো আর টুপুরকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব না দিয়ে কেমন কায়দা করে অনিশ্চয়বাবুকে পেড়ে ফেলল! এখন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, টুপুরদের সঙ্গে পেলে অনিশ্চয় মজুমদার ধন্য হয়ে যাবেন!

অনিশ্চয় পার্থকে বললেন, "আপনাদের কেন নিয়ে যেতে চাইছি জানেন? স্পেশ্যালি ম্যাডামকে? আরে মশাই, আমাদের পুলিশের চোখ একটা বাঁধাধরা গতে চলে। তাতে সব কিছুই ধরা পড়ে বটে, তবে ছোটখাটো দু'-একটা জিনিস তো নজর এড়িয়েও যায়। আর আমাদের ম্যাডামের অবজারভেশন তো মন্দ নয়, উনি সঙ্গে থাকলে পুলিশি চোখের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে যেতেও পারে। বলুন, ঠিক কিনা?"

"একদম ঠিক। সরকারি কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করাও তো মিতিনের কর্তব্য।"

"তা হলে আর বসে কেন! রেডি হয়ে নিন। পৌনে এগারোটা বাজে, আর বেশি লেট করলে বিকেল বিকেল ফিরতে পারব না।"

স্নান সেরে তৈরি হতে মিনিট পনেরোর বেশি সময় নিল না পার্থ। টুপুরের তো শুধু ড্রেস বদলানোটুকু বাকি ছিল। মিতিনও প্রস্তুত ঝটপট। বুমবুমকেও যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হল, তবে সে মোটেই বেরোতে রাজি নয়। দুপুরে তার প্রাণের বন্ধু কুটুস আসবে, দু'জনে

পাল্লা দিয়ে খেলবে রোড র‍্যাশ। দিনভর বুমবুম কী কী করবে, আর কী করবে না, তার একটা লম্বা তালিকা বুমবুমকে শুনিয়ে মিতিন যখন অনিশ্চয়ের গাড়িতে উঠল, ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা সতেরো।

লালবাতি লাগানো চিরাচরিত সাদা অ্যাম্বাসাডর নয়, অনিশ্চয়ের বাহন আজ নেভি-ব্লু টাটা সুমো। নিজে তিনি বসেছেন ড্রাইভারের পাশে, পিছনে টুপুররা ত্রিমূর্তি। বড় রাস্তায় পড়ার মুখে গাড়ির গতি কমাতে হল একটু। সামনে একটা ছোট্ট শোভাযাত্রা। এক বৃদ্ধের মৃতদেহ খাটিয়ায় চাপিয়ে খই ছিটোতে ছিটোতে শ্মশানে চলেছে জনাকয়েক মানুষ।

পার্থ হৃষ্ট স্বরে বলল, "যাক, আজকের জার্নিটা মনে হচ্ছে ভালই হবে।"

টুপুর অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

"জানিস না, ডেডবডি দেখে বেরোলে যাত্রা শুভ হয়?"

মিতিন মুখ বাঁকাল, "থামো তো, যত্ত সব কুসংস্কার!"

সড়কপথে সরাসরি বাসন্তী পৌঁছোনো যায় না। গাড়ি যায় সোনাখালি পর্যন্ত। বাসন্তীর চারপাশে জল। সোনাখালি আর বাসন্তীর মাঝে খাল আছে একখানা। নাম পুরন্দর। ভোর থেকে রাত, পুরন্দরে ফেরি পারাপার চলে অবিরাম।

সোনাখালি অবধি যেতে প্রায় দুটো বেজে গেল। পথে একবারই মাত্র থেমেছিল গাড়ি, ঘটকপুকুর বাজারে। ডাব

খাওয়ার জন্য। বাদবাকি সময় শাঁই শাঁই ছুটেছে টাটা সুমো। প্রায় গোটা পথই দু'ধারে শুধু মাছের ভেড়ি। মাইলের পর মাইল জলাশয়, চলছে তো চলছেই। এদিকটায় যে এত ভেড়ি আছে টুপুরের জানা ছিল না। মাছের আঁশটে গন্ধে মাঝেমাঝে গা যেন গুলিয়ে ওঠে।

গাড়িতে অনেক জ্ঞানও লাভ হয়েছে টুপুরের। পার্থমেসোর কল্যাণে। সুন্দরবন নিয়ে যা দীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিল মেসো! সুন্দরবন নাকি পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ, সুন্দরবনের বেশিরভাগটাই নাকি পড়েছে বাংলাদেশে, সুন্দরবনের মতো ভয়ংকর অরণ্য নাকি দুনিয়ায় আর দুটো নেই। জঙ্গলের নদীগুলোতে তো কুমির আর কামট থিকথিক করে। জলে নেমেছ কী ওমনি ঘ্যাচাং-ফু, পা একেবারে ছিঁড়ে নেবে। আর ডাঙায় তো ঘুরছেই পৃথিবীর হিংস্রতম প্রাণী। দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বিষধর সাপও কিলবিল করছে জঙ্গলে। কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড় ...। এদের কেউ কেউ নাকি গাছ থেকেও ঝোলে। এ ছাড়া জোঁক আর বিষাক্ত পোকামাকড় তো আছেই।

তা সোনাখালি সুন্দরবনের অংশ হলেও সোনাখালিতে কিন্তু জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নেই। বড়সড় এক গঞ্জই বলা যায়। অজস্র দোকানপাট। লোকজনের ভিড়ও নেহাত কম নয়।

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়েছিল বাসস্ট্যান্ডের পাশেই। গাড়িতে বসেই অনিশ্চয় হুকুম ছুড়লেন, "মানিক, নেমে ঝটপট একটা ভাল খাওয়ার জায়গা খুঁজে বার করো তো।"

মিতিন বলল, "এখানে কেন? একেবারে বাসন্তী গিয়েই তো লাঞ্চ সারলে হত।"

"ওরে বাবা, না না। ছুঁচোরা পেটে খঞ্জনি বাজাচ্ছে। বেশি খিদে পেলে আমার আবার দৃষ্টিশক্তিটাও কেমন ক্ষীণ হয়ে আসে।"

"আমারও।" পার্থও তালে তাল দিল, "শুধু চোখ কেন, আমার হাত-পা-কান-মাথা, সবই কেমন ঢলঢলে হয়ে যায়।"

খিদে টুপুরেরও পেয়েছিল। সকালের দু'খানা মশলা ধোসা কখন হজম। রাস্তাতেও যা ঝাঁকুনি ছিল, বাপ্‌স!

মিনিট দু'-তিনের মধ্যেই একটা ভদ্রগোছের হোটেলের সন্ধান মিলল। তেমন আহামরি কিছু নয়, তবে পরিবেশ মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। এই ভরদুপুরে দোকানটায় তেমন ভিড়ও নেই, শুধু জনা দু'-চার হাটুরে লোক বেঞ্চিতে বসে ভাত খাচ্ছে।

দোকানের মালিকটি মাঝবয়সি। খালি গা, পরনে চেক লুঙ্গি। কাউন্টারে বসে পাখার বাঁট দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিল লোকটা। টুপুরদের দলটাকে দেখে সে রীতিমতো শশব্যস্ত। সাদা পোশাকে থাকলেও অনিশ্চয় যে একজন জাঁদরেল কেউ, সেটা বুঝি তাঁর হাবভাব, হাঁটাচলা দেখেই পলকে মালুম করে নিয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বিনয়ে গদগদ স্বরে বলল, "আসুন স্যার, বসুন স্যার। অ্যাই ভুতো, তিন নম্বর টেবিলটায় ভাল করে ন্যাতা লাগা তো।"

সঙ্গেসঙ্গে ভুতো নামের কালো-সিড়িঙ্গে ছোকরাটি নেমে পড়েছে কাজে। রাস্তাতেই একগাদা জলের বোতল কিনেছিলেন অনিশ্চয়। তার মধ্যে থেকে ঢাউস বোতল দু'খানা বগলদাবা করে বসলেন বেঞ্চিতে। ভরাট গলায় হাঁক ছাড়লেন, "চারটে গ্লাস দিয়ে যাও তো। গরম জলে ধুয়ে।"

পার্থ ফুট কাটল, "গরম জল লাগবে না। এদের ড্রামের জল এমনিতেই তেতে আছে।"

মালিক নিজেই গ্লাস এনে রাখল টেবিলে। জিজ্ঞেস করল, "বলুন স্যার, কী খাবেন?"

"প্লেন পাঁঠার ঝোল আর ভাত, ব্যস।"

"আজ্ঞে, আজ বেস্পতিবার স্যার। পাঁঠা তো হবে না।"

"তা হলে মুরগি চলুক।"

"মুরগি স্যার ফুরিয়ে গিয়েছে। বাটাম পাখির মাংস পেয়ে যাবেন।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "বাটাম পাখিটা কী?"

মিতিন বলল, "ছোট ছোট পাখি। কাদাখোঁচারই একটা ভ্যারাইটি। ট্রাই নিয়ে দেখতে পারিস, ... বেশ সুস্বাদু।"

পার্থ তো মাংস হলেই খুশি। গন্ডার কিংবা গোরিলা হলেও তার চলত। অনিশ্চয়েরও আপত্তি নেই। তিনি নাকি সর্বভুক। গোরু-শুয়োর-মোষ-হরিণ সবই তাঁর চলে। নাগাল্যান্ডে তিনি নাকি সাপের মাংসও খেয়েছেন! অতএব অর্ডার দিতেও আর দ্বিধা রইল না।

আহার আসার আগে প্রায় হাফ বোতল জল খেয়ে ফেললেন অনিশ্চয়। পার্থ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "বাসন্তী পৌঁছে আপনি কি সোজা ডক্টর সান্যালের বাড়ি যাবেন? নাকি আগে বাসন্তী থানা?"

"না না, থানায় এখন কিচ্ছুটি জানাব না। সটান সুমন্ত্র সান্যালের বাড়ি, জেরাটেরা সারব, তারপর থানার খবর নিচ্ছি। আস্ত এক বিজ্ঞানী বেমালুম লোপাট হয়ে যাবে, এ কি মামদোবাজি পায়া হ্যায়?"

"হুম। আশা করি ডক্টর সান্যাল নিজের অজান্তে কিছু ক্লু ছেড়ে গিয়েছেন।"

"সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতেই তো এই শর্মার আগমন।"

কথার ফাঁকেই গরমগরম ভাত হাজির। লাল লাল মোটা মোটা চাল। সম্ভবত ঢেঁকিছাঁটা। সঙ্গে স্টিলের বাটিতে আলু-ঝোলসহ মাংস। অনিশ্চয়ের আর তর সইছিল না, আস্ত বাটিটাই উলটে দিলেন শালপাতার থালায়। খাচ্ছেন হাপুসহুপুস। বড় বড় গ্রাসের ঝোলভাত নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছে তাঁর মুখগহ্বরে। পার্থও পিছিয়ে নেই, তারও হাত-মুখ বেজায় ব্যস্ত। মিতিন টুপুরও ভাত ভাঙল।

ভাতের স্বাদটা বেশ। কেমন যেন মিষ্টিমিষ্টি। মাংসটাও অন্য রকম। অনেকটা দিশি মুরগির মতো, তবে হাড়গুলো ভারী নরম। তৃপ্তি করে খাচ্ছিল টুপুর। নিঃশব্দে। একটা প্রশ্ন বহুক্ষণ ধরে পাক খাচ্ছে মাথায়। শেষমেশ জিজ্ঞেসই করে ফেলল, "আচ্ছা মিতিনমাসি, সুমন্ত্র সান্যাল একজন বিজ্ঞানী মানুষ...নিশ্চয়ই প্রখর বুদ্ধিমান... তিনি যদি স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে থাকেন, তা হলে তাঁকে খুঁজে বের করা কি সহজ হবে?"

অনিশ্চয় আগ বাড়িয়ে বললেন, "স্বেচ্ছায়, না অনিচ্ছায় জানছ কী করে? সুমন্ত্রবাবুকে তো কেউ গুমও করতে পারে।"

"কেন গুম করবে?"

"মোটা মুক্তিপণের আশায়।"

"পণের টাকাটা দেবে কে? উনি তো শুনলাম এখানে একাই থাকেন।"

"এ যুক্তি অবশ্য জজে মানে। হয়তো অন্য কোনও মোটিভ আছে তা হলে," পার্থ এক টুকরো মাংস মুখে পুরে বলল, "অনেক সময় উগ্রপন্থীরাও বিজ্ঞানীদের তুলে নিয়ে যায়। ফর্মুলাটর্মুলা হাতানোর জন্য।"

"কিন্তু ক্যান্সার নিয়ে রিসার্চ করা বিজ্ঞানীকে কি তারা আমল দেবে? সুমন্ত্র সান্যাল অ্যাটম বোমাটোমা নিয়ে কাজ করলেও নয় কথা ছিল। ঠিক কিনা?"

দোকানের মালিকটি পেঁয়াজ-লঙ্কা রাখতে এসেছিল টেবিলে। টুপুরদের কথোপকথন শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আমতা আমতা করে বলল, "কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনারা কি ঝুঁকোবাবুর কথা বলছেন?"

অনিশ্চয়ের চোখ তেরচা, "কে ঝুঁকোবাবু?"

"ওই যে, বাসন্তীতে থাকেন। যিনি সাপের বিষ থেকে কী সব

ওষুধপত্র বের করছেন। লম্বা মানুষ তো, অনেকটা ঝুঁকে হাঁটেন, তাই সকলে ঝুঁকোবাবু বলে।"

"অ। আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে?"

"বিলক্ষণ। যখন থেকে উনি নস্করদের বাগানবাড়িটা কিনে বাসন্তীতে বসবাস শুরু করলেন, তখন থেকেই চিনি। সেও না হোক চার-পাঁচ বছর হবে। ভারী সজ্জন ব্যক্তি। অত পণ্ডিত, অথচ এতটুকু দেমাক নেই। বাসন্তী থেকে এপারে এলে আমার দোকানের সামনে দিয়েই তো ওঁকে যেতে হয়। কখনওসখনও আমার এখানে চা-বিস্কুটও খান।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ স্যার। ঝুঁকোবাবুর কাজের লোকটির সঙ্গেও ভাল পরিচয় আছে। নীলাম্বর। বসিরহাটের দিকে বাড়ি। ন্যাজাটে। নীলাম্বরও বলে, বাবুর মতো নাকি মানুষ হয় না।"

অনিশ্চয় সোজা হয়ে বসেছেন। পুলিশি মেজাজে বললেন, "তা এতই যদি জানেন, আপনাদের ঝুঁকোবাবুর হারিয়ে যাওয়ার সংবাদটিও নিশ্চয়ই আপনার অবিদিত নেই?"

লোকটা সেকেন্ডের জন্য থমকাল। পরক্ষণেই মুখে একগাল হাসি, "ও হরি, আপনারা এখনও লাস্ট নিউজ়টা পাননি? ঝুঁকোবাবু তো ফিরে এসেছেন।"

"অ্যাঁ?" অনিশ্চয়ের গলা দিয়ে শব্দটা বিটকেলভাবে ঠিকরে এল। মুখ হাঁ হয়েই রয়েছে, আর বন্ধ হচ্ছে না।

টুপুরও হতভম্ব। একবার পার্থমেসোকে দেখছে, একবার মিতিনমাসিকে। দু'জনেরই খাওয়া থেমে গিয়েছে, দু'জনেরই চোখে বিস্ময়!

পার্থ বিড়বিড় করে বলল, "যাঃ বাবা! সুমন্ত্র সান্যাল ইজ় ব্যাক? কবে?"

"এই তো, গত কালই, রাতে। তখন বোধহয় সাড়ে আটটা মতো হবে। দোকানে গরম বলে বাইরে টুল নিয়ে বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখি ঝুঁকোবাবু ঘাড় নামিয়ে লম্বালম্বা পায়ে ফেরিঘাটের দিকে যাচ্ছেন! সোনাখালি বাজারের কেউই আগে খেয়াল করেনি, আমিই প্রথম। আমার মুখ থেকে শুনেই তো দু'-চারজন ঘাটের দিকে দৌড়োল। দেখে এল স্বচক্ষে," লোকটার হাসি আরও চওড়া হল, "তারপর তো হাওয়ায় হাওয়ায় রটে গেল খবরটা। এই তো, এগারোটা নাগাদ টিভির লোকরাও ক্যামেরা কাঁধে হুড়তে-পুড়তে হাজির।"

"টিভির লোক?" অনিশ্চয়ের নাকের পাটা ফুলে উঠল, "আমার আগে তারা খবর পায় কী করে?"

মিতিন বলল, "নিশ্চয়ই বাসন্তীতে ওদের সোর্স আছে এবং ক্যানিংয়ে কোনও করেসপন্ডেন্ট। সোর্স মারফত খবর পেয়েই চ্যানেল হয়তো নিউজ়টা ক্যাচ করতে এসে গিয়েছে। সর্বপ্রথম কভার করতে পারলে চ্যানেলের ইজ্জত বেড়ে যাবে না?"

"তবু... খবরটা তো আমারই আগে পাওয়া উচিত," অনিশ্চয় গজগজ করছেন, "আমার সোর্স এখানে কী করছে? ফ্রায়িং ভ্যারেন্ডা?"

লোকটা চোখ নাচাল, "আপনারা কোথা থেকে স্যার? কোন নিউজ় পেপার?"

"আমরা কাগজের লোক নই।" অনিশ্চয়ের গোমড়া জবাব। পর মুহূর্তেই ভুরু কুঁচকে পালটা প্রশ্ন, "তা সেই টিভি চ্যানেলের লোকগুলো কি এখনও বাসন্তীতে?"

"গুলো নয় স্যার। মাত্র দু'জন। খানিক আগে তারা ফিরেও গিয়েছে।"

"কেন?"

"ঝুঁকোবাবু নাকি দেখাই করেননি। গেট থেকেই হাঁকিয়ে দিয়েছেন।"

মিতিন চাপা স্বরে অনিশ্চয়কে বলল, "যাক, নিশ্চিন্ত হলেন তো? আপনাকে আর টিভি ক্যামেরা পাকড়াও করতে পারল না!"

"যা বলেছেন! ব্যাটারা যা উলটোপালটা প্রশ্ন জোড়ে!" অনিশ্চয়ের স্বরও খাদে, "মনে হয় যেন আমরাই আসল অপরাধী!"

"আর কী, এবার তা হলে ঠান্ডা মাথায় সত্যিকারের অপরাধটা সম্পূর্ণ করুন।"

"মানে?"

"আশা করি জানেন, বাটাম-কাদাখোঁচা... আই মিন, স্নাইপ্‌স জাতীয় পাখি হত্যা আইনত দণ্ডনীয়?" মিতিন ঠোঁট টিপে হাসছে, "আর আপনি আইনের রক্ষক হয়ে এতক্ষণ সেই পাখিরই মাংস...?"

মুখটাকে গম্ভীর রাখতে গিয়েও অনিশ্চয় হেসে ফেললেন, "ঝঞ্ঝাট পাকালেন তো! এখন আর কি শান্তিতে এ পাখি গলা দিয়ে নামবে?"

"আহা, আপনি তো কচি মুরগি ভেবে খাচ্ছেন।" পার্থ চোখ টিপল, "দোকানদার যদি আপনাকে ঠকিয়ে অন্য কিছু খাওয়ায়, তাতে আপনার কী দোষ!"

অনিশ্চয় অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। হালকা মেজাজে সাঙ্গ হল আহারপর্ব। বিল মিটিয়ে পার্থর সঙ্গে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন অনিশ্চয়। টুপুরও মৌরি মুখে দিয়ে মিতিনের সঙ্গে বেরিয়ে আসছিল, হঠাৎই মিতিন কী ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হোটেল মালিকটিকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ডক্টর সুমন্ত্র সান্যালকে দেখে আপনারা তো কাল খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তাই না?"

"হব না? মানুষটাকে নিয়ে এত তোলপাড় হল। টিভিতে, খবরের কাগজে...!"

"তা আপনারা কেউ গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ ক'দিন তিনি ছিলেন কোথায়? "

"সুযোগ পেলাম কই? যা হনহনিয়ে চলে গেলেন। ভুটভুটিটাও ছেড়ে দিল সঙ্গেসঙ্গে!"

"আর-একটা কথা। ডক্টর সান্যালের কুকুরটাকেও কি পাওয়া গিয়েছে?"

"কই আর! সেটাও তো একটা খবর। গত হপ্তায় সোনাখালির হাটে এসেছিল নীলাম্বর। তখনই বলছিল, কুকুরটার জন্য ঝুঁকোবাবু নাকি বড় বিমর্ষ থাকেন।"

"কীভাবে হারাল কিছু শুনেছেন?"

"কী বলি বলুন তো দিদি? সে কুকুর তো ইদানীং নাকি রাতে

ছাড়াই থাকত। কোনও শেয়ালটেয়াল ঢুকেছিল হয়তো বাগানে। তার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে...। অবশ্য তা হলে তো কুকুরটার বডিই পাওয়া যেত।"

"হুম।"

আনমনা মুখে বেরিয়ে এল মিতিন। পার্থ কানখাড়া করে মিতিনের প্রশ্নগুলো শুনছিল। ঠাট্টার সুরে বলল, "বিজ্ঞানী অন্তর্ধান রহস্য গুবলেট হয়ে গেল বলে তুমি কি এখন ডোবারম্যানটাকে নিয়ে পড়লে?"

"নাহ্। জাস্ট কৌতূহল।"

পার্থ দু'হাত তুলে অনিশ্চয়কে বলল, "তা হলে আর আমাদের বাসন্তী যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না তো? গাড়ি এখানে রেখে আমরা তা হলে একটু নদীবক্ষে ভ্রমণ করে আসি?"

"আপনারা বেড়াতে চাইলে বেড়ান," অনিশ্চয়ের মুখে গাম্ভীর্য

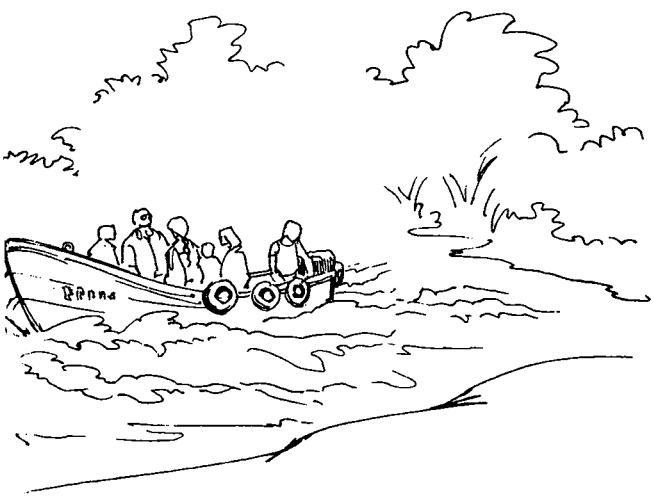

ফিরে এসেছে, "আমি বাসন্তী যাচ্ছি। টু মিট দ্যাট ট্রাবলশুটার। কখনও ফোন করে কুকুর হারিয়েছে বলে জ্বালাতন করবেন, কখনও নিজেই হারিয়ে গিয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করবেন, এ তো চলতে পারে না। তা ছাড়া সোনাখালির কোন লোক কী গপ্পো শুনিয়ে দিল, তার উপর বেস করে আমি নাচতে নাচতে ফিরে গেলাম...উঁহু, আমি সে বান্দা নই। ইনফর্মেশনটা ভেরিফাই করতে হবে না?"

মিতিন বলল, "বটেই তো। আমাদের তো একবার চর্মচক্ষে দেখে আসা দরকার।"

পার্থ বলল, "কিন্তু শুনলে তো, উনি কাউকে মিট করছেন না!"

"আলবাত করবেন।" অনিশ্চয় শূন্যে মুঠো পাকালেন, "আমি গিয়ে দাঁড়ালে...," বলতে বলতে অনিশ্চয় আরও উত্তেজিত, "যদি সত্যি সত্যি সুমন্ত্র সান্যাল ফিরে এসে থাকেন, তবে বাসন্তী থানার কপালে খুব দুঃখ আছে। ফর নাথিং আমাকে এত দূর ছুটিয়ে আনা..."

"আহা, এত চটছেন কেন?" মিতিন ঠান্ডা করতে চাইল অনিশ্চয়কে, "ধরে নিন না, এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ করার জন্যই একটা দিন খরচ করলেন।"

"হুঁঃ। যত্তো সব...!"

মানিককে গাড়িতেই থাকতে বলে ঘাটের দিকে এগোলেন অনিশ্চয়, গটমট পায়ে। কাছেই ঘাট। ভাটার টান চলছে এখন পুরন্দরে, জল খানিকটা সরে গিয়েছে, পাড়ে থকথকে এঁটেল মাটি। ভুটভুটিতে ওঠার জন্য সরু কাঠের পাটাতন পেতে দেওয়া হয়েছে একটা। অত সরু কাঠের উপর দিয়েও দিব্যি যাতায়াত করছে স্থানীয় লোকজন। কেউ কেউ আবার কাঁধে সাইকেল নিয়ে। কিংবা মালের বোঝা।

টুপুরের তো দেখেই বুক ঢিপঢিপ করছিল। পাটাতন থেকে পা

পিছলোলেই চিত্তির! ওই তলতলে কাদায় কোমর পর্যন্ত গেঁথে যাবে! নিশ্বাস বন্ধ করে কাঠটা পার হল টুপুর। শেষ কয়েকটা পা তো প্রায় দৌড়ে। ভুটভুটিতে উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

লোক ভরতি হতেই মেশিন বসানো নৌকো সশব্দে রওনা দিয়েছে। সোনাখালি থেকে বাসন্তী খুবই সামান্য দূরত্ব। তিন-চার মিনিটের বেশি লাগবার কথা নয়। ভাটার জন্য সময় যেন একটু বেশিই লাগছে। সওয়া তিনটে বাজে। সূর্য অনেকটাই পশ্চিমে হেলে গিয়েছে, তবু রোদ্দুরের কী তেজ! হাওয়া দিচ্ছে অল্প অল্প। নোনা বাতাস। কেমন যেন একটা গন্ধও আছে বাতাসে। আঁশটেআঁশটে, সোঁদাসোঁদা।

এটাই কি সুন্দরবনের গন্ধ? টুপুর বুঝতে পারছিল না।

বাসন্তীতে ডক্টর সুমন্ত্র সান্যালের ডেরা খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন নয়। প্রতিটি ভ্যান-রিকশাওয়ালাই বাড়িটি চেনে। তবে ভ্যান-রিকশায় চড়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়ের ঘোর আপত্তি। খোলা পাটাতনে অমন বেআব্রুভাবে পা ঝুলিয়ে বসলে আই জি সাহেবের নাকি মানসম্মান খোয়া যাবে!

অগত্যা হন্টন। লোকমুখে শুনে যা বোঝা গেল, মাত্র মিনিট দশ-বারোর পথ। পিচরাস্তা ধরে ফেরিঘাটের লাগোয়া বাজারমতো এলাকাটা পেরোলে একটা গির্জা পড়ে বাঁয়ে। তারপর আরও খানিক এগোলে, ডান হাতে বিজ্ঞানীর বাসভবন। একতলা বাড়ি। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বলে দূর থেকে নজরে আসে না। তবে লম্বালম্বা

লোহার শিকওয়ালা গেটখানার সামনে এলে গোটা বাড়িটাই চোখে পড়ে যায়। অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি। সামনে জমিও নেহাত কম নেই। বাড়ির ছাদে শোভা পাচ্ছে ডিশ অ্যান্টেনা এবং সোলার প্যানেল।

ভিতর থেকে তালা ঝুলছে গেটে। অনিশ্চয় হাঁক পাড়লেন, "অ্যাই, কে আছ? গেট খোলো।"

সাড়াশব্দ নেই।

এক-দু'বার ডাকাডাকি করেই অনিশ্চয়ের মেজাজ টংয়ে। বাজখাঁই হুংকার ছুড়লেন, "হচ্ছেটা কী, অ্যাঁ? কতক্ষণ গরমে দাঁড়িয়ে থাকব? তালা ভেঙে ঢুকতে হবে নাকি?"

এতক্ষণে কাজ হল। কোত্থেকে এক বছরতিরিশের লোক হাঁপাতে হাঁপাতে উপস্থিত। ফটকের ওপার থেকে প্রশ্ন করল, "আপনারা...?"

"ডক্টর সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"কিন্তু স্যার তো কারও সঙ্গে দেখা করছেন না। ওঁর শরীর ভাল নেই।"

পার্থ অনিশ্চয়কে দেখিয়ে বলল, "এঁকে চেনেন? পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আই জি। অনেক উঁচুতলার অফিসার। কলকাতা থেকে এসেছেন। না ঢুকতে দিলে উনি কিন্তু থানা থেকে পুলিশ এনে দরজা ভাঙবেন।"

"ও, আপনারা পুলিশ? আগে বলবেন তো!" লোকটা চটপট গেট খুলে দিল, "সকাল থেকে এত উটকো লোক এসে উৎপাত করছে! এই তো, কারা যেন ক্যামেরাট্যামেরা নিয়ে এসেছিল। যত বলি স্যার ক্লান্ত, আজ বিশ্রাম নেবেন...কিছুতেই শোনে না।"

কম্পাউন্ডে ঢুকতে ঢুকতে মিতিন জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম তো নীলাম্বর, তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। নীলাম্বর বিশ্বাস।"

"ডক্টর সান্যালের আসিস্ট্যান্ট?"

"ওই আর কী।" নীলাম্বর গলে গেল, "স্যারের দেখাশুনো করি। যতটুকু পারি সাহায্যও করি কাজে।"

টুপুর লোকটাকে ভাল করে দেখে নিচ্ছিল। বেশ ঝকঝকে চেহারা, সুন্দর স্বাস্থ্য, কায়দা করে ছাঁটা চুল, হাতে সোনালি ডায়ালের ঘড়ি, পরনে আধুনিক কেতার থ্রি-কোয়ার্টার শর্ট্স, স্যান্ডো গেঞ্জি, পায়ে কেড্স। দেখে কাজের লোক বলে আদৌ মনে হয় না। অনুমান করতে অসুবিধে নেই, সুমন্ত্র সান্যালের বাড়িতে বেশ জাঁকিয়েই বাস করে নীলাম্বর।

গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত মোরাম বিছানো সরু পথ। সারসার ইট দিয়ে ঘেরা। দু'পাশে ফুলগাছ আছে কিছু। গোলাপ, জবা, বেল, কামিনী। তবে গাছগুলোর চেহারা ভাল নয়, কেমন মরামরা টাইপ। গোলাপ আর জবা ফুটে আছে, কিন্তু বেশ শুকনো শুকনো। একটা ঝাঁকড়া আমগাছও আছে, তবে তাতে ফল আসেনি। আমগাছের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে খান চার-পাঁচ বাঁশ।

বারান্দায় উঠে সামনের বড় ঘরটা খুলে দিল নীলাম্বর। বলল, "ড্রয়িংরুমে একটু বসুন। আমি স্যারকে খবর দিচ্ছি।"

মিতিন সম্ভ্রমের সুরে জিজ্ঞেস করল, "ডক্টর সান্যালের কি সত্যিই শরীর খারাপ? মানে শুয়েটুয়ে আছেন?"

"দেখছি। স্যার বোধহয় এখন ল্যাবরেটরিতে। উনিই বলে রেখেছেন, আজেবাজে লোক এলে যেন ভাগিয়ে দেওয়া হয়। তা বলে সব্বাইকে তো আর সে কথা...। এই তো, সকালবেলা থানা থেকে দারোগাবাবু এসেছিলেন। তিনি তো ভিতরে গিয়ে কথা বলে এলেন।"

অনিশ্চয়ের চোখ সরু, "থানা কখন এসেছিল?"

"এই ধরুন, সাড়ে ন'টা-দশটা। আমি নিজেই স্যারের নিউজ়টা থানায় জানিয়ে আসব বলে সাইকেল বের করছি, তখনই।"

"আপনার কিন্তু আরও আগেই থানায় বলে আসা উচিত ছিল।"

"আমি তো কাল রাতেই যেতে চেয়েছিলাম। স্যার বললেন, তাড়া কীসের! আর তো তোমার টেনশন করার কিছু নেই, সকালে ধীরেসুস্থে যেয়ো।"

"অ।"

নীলাম্বর অন্দরে যেতেই অনিশ্চয় প্রায় গর্জন করে উঠলেন, "দেখেছেন লোকাল পি এসের বেআক্কেলেপনাটা? আগে খবরটা পেয়ে গেলে থোড়াই আমায় কাজ ফেলে ছুটে আসতে হয়!"

"উত্তেজিত হবেন না, ক্রোনোলজিক্যালি ভাবুন।" মিতিন শান্ত করতে চাইল অনিশ্চয়কে, "আপনার দারোগাবাবুটি খোঁজখবর করে হেলতে-দুলতে থানায় ফিরেছেন না হোক সাড়ে দশটায়। তিনি তো মন্ত্রীর হুড়োর খবর জানেনও না, আপনি তাঁকে তাড়াও দেননি। অতএব তিনিও মিসিং পার্সন্‌স স্কোয়াডে সংবাদটি দিয়েছেন ঢিমেতালে। মিসিং পার্সন্‌স স্কোয়াড যখন আপনাকে খবরটি দিতে চাইছে, তখন আপনি অন দ্য ওয়ে টু বাসন্তী। সম্ভবত মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কের বাইরে। যদি তাঁরা এস এম এসও করে থাকেন, নেটওয়ার্কের আওতায় না এলে তো আপনি সেটিও পাবেন না।"

"হুঁ।" অনিশ্চয় কিঞ্চিৎ শীতল হলেন। গলা নামিয়ে বললেন, "বিজ্ঞানীমশাইটিও যথেষ্ট তিক্‌ড়ম আছেন। কুকুর হারালে এখান থেকে আলিপুরে ফোন মারছেন, অথচ নিজে হারিয়ে ফেরত আসার পর বলেন কিনা টেনশান কোরো না!"

পার্থ চাপা স্বরে বলল, "দেখবেন, চটে গিয়ে ডক্টর সান্যালকে কথা শোনাবেন না যেন। টের পেয়েছেন তো, উনিও যথেষ্ট হেভিওয়েট মানুষ!"

কথাবার্তার মাঝেই ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বোলাচ্ছিল টুপুর। বড় সাইজের ঘরখানার সাজসজ্জা বেশ ছিমছাম। আসবাব সবই রট আয়রনের। সোফা, সেন্টার টেবিল, স্ট্যান্ড ল্যাম্প...। দেওয়ালে গাঁথা কাচের আলমারিতে প্রচুর ইংরেজি বই। টুপুর উঠে বইগুলো একবার দেখে এল। গল্প-উপন্যাস নয়, ভারী ভারী বিজ্ঞানের কিতাব। বাঁধানো বিদেশি জার্নালও আছে কিছু। ঘরের এক কোণে চাকালাগানো ক্যাবিনেটে টিভি, ডিভিডি প্লেয়ার। গোছা করে ভিসিডিও রাখা আছে পাশে।

একদম উপরের ডিস্‌কে চোখ পড়তেই টুপুর হাঁ। হাতে তুলে দেখাল সবাইকে।

পার্থ বলল, "আইব্বাস! মুঘল-এ-আজম! ডক্টর সান্যাল এসব ফিল্‌ম দেখেন নাকি?"

মিতিন হেসে বলল, "বিজ্ঞানীর কি অন্য কিছুতে আগ্রহ থাকতে পারে না? মনে রেখো, আইনস্টাইন বেহালা বাজাতেন, সত্যেন বোস এসরাজ, ফেইনম্যান ড্রাম। সুমন্ত্রবাবুকেই বা রসকষহীন ধরে নিচ্ছ কেন? আমার তো বরং ভদ্রলোকের রুচি সম্পর্কে শ্রদ্ধাই জাগছে। সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার, কী মিষ্টি অ্যাপেলহোয়াইট দেওয়ালের রং..."

"হুঁ।" পার্থ নাক টানল, "ঘরটা সদ্য রং করা হয়েছে। মেঝেতে এখনও রঙের ছিটে।"

নীলাম্বর ফিরে এসেছে। ট্রেতে চার গ্লাস শরবত সাজিয়ে। কাঁচুমাচু মুখে বলল, "স্যার কম্পিউটারে ব্যস্ত এখন। আপনাদের বসতে হবে। ততক্ষণ একটু আমপোড়ার শরবত খান।"

অনিশ্চয়ের মুখে আবার বিরক্তির ছায়া। পার্থ তাঁকে সামাল দিতে বলে উঠল, "আহা, এই আমপোড়ার শরবতেরই দরকার ছিল এখন। খেয়ে নিন মজুমদারসাহেব, শরীর মাথা দুই-ই ঠান্ডা হবে।"

নীলাম্বর নম্র স্বরে জিজ্ঞেস করল, "একটু মিষ্টিটিষ্টি খাবেন তো স্যার? দূর থেকে আসছেন..."

"এখন কিচ্ছু লাগবে না।" মিতিন মাথা নাড়ল, "সোনাখালিতে ভাত খেয়েছি। পেট এখন টইটম্বুর। বরং আপনি একটু বসুন তো। আপনার সঙ্গে খানিক গল্প করি।"

নীলাম্বর বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা মোচড়াচ্ছে, "আমাকে আবার আপনি কেন। তুমিই বলুন দিদি।"

মিতিন নরম গলায় প্রশ্ন করল, "তুমি স্যারের কাছে কত দিন আছ?"

"তা প্রায় চার বছর।"

"এখানে তোমার কাজটা কী?"

"সবই করি। রান্নাবান্না, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ, ওয়াশিং মেশিনে স্যারের কাপড়চোপড় কাচা, স্যারের সাপঘরের দেখভাল...। ল্যাবরেটরিতেই হাতেহাতে স্যারকে সাহায্য করি।"

"বাহ, অল ইন ওয়ান! তা তোমার স্যার এ ক'দিন ছিলেন কোথায়?"

"কী জানি! কলকাতাতেই হবে।"

"জিজ্ঞেস করোনি?"

"করেছিলাম। বললেন, 'তোর জেনে কী হবে!' আমি বললাম, 'তা যেখানে খুশি থাকুন, খবর দ্যাননি কেন?' জবাবই দিলেন না কোনও। এমন গোমড়া মুখে আছেন, বেশি ঘাঁটাতে সাহস হচ্ছে না।"

"উনি কি এমনিতে বেশ হাসিখুশি? দিলখোলা?"

"তেমন আমুদে তিনি কোনওদিনই নন। সবসময় চিন্তায় ডুবে থাকেন তো। তবে রজার হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে যেন বড় বেশি মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। খালি বলতেন, 'রজারটাকে বোধহয় মেরেই ফেলেছে রে।' "

"কে মারবে?"

"কী জানি!"

"উনি কি কাউকে সন্দেহ করতেন?"

"তাও তো জানি না দিদি। কখনও তো কারও নাম করেননি।"

"হুম।" মিতিন শরবত শেষ করে ট্রেতে গ্লাস রাখল। রুমালে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল, "আচ্ছা নীলাম্বর, তুমি যখন দেখলে শুক্রবার রাতে তোমার স্যার ফিরলেন না, শনিবারই তুমি থানায় গেলে না কেন?"

"স্যার একবার বলেছিলেন, রাতে না ফিরলে পরদিন সকালে আসবেন। তাই ভাবলাম শনিবারটা দেখি। রোববারও সারাদিন ভাবছি, এই বুঝি স্যার এলেন, এই বুঝি এলেন...। সোমবার সকালে আর দেরি করিনি, দারোগাবাবুর কাছে রিপোর্ট লিখিয়ে এসেছি। কিন্তু উনি যে কাজেই আটকে গেছেন, কী করে বুঝব বলুন? বিপদআপদের ভয়টাই তো সবার আগে মাথায় আসে।"

"বটেই তো।... তা তোমার স্যারের আত্মীয়স্বজন সব কোথায়?"

"ম্যাডাম...মানে স্যারের ওয়াইফ আর মেয়ে তো থাকেন আমেরিকায়। আমি তাঁদের একবারই মাত্র দেখেছি। গত শীতের আগের শীতে। বাসন্তীতে এসে তাঁরা তেরাত্তিরের বেশি টিকতে পারেননি, কলকাতা চলে গিয়েছিলেন।"

"ও। তার মানে কলকাতায় ডক্টর সান্যালের আত্মীয়রা আছেন?"

"আমি নিশ্চয় করে বলতে পারব না দিদি। স্যার নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কখনও তো কিছু বলেননি।... তবে হ্যাঁ, স্যারের এক ভাই আছেন। মাঝেমাঝে তিনি ফোনও করেন।"

"কোথায় থাকেন তিনি?"

"সেটাও বলতে পারব না। সম্ভবত কলকাতাতেই। কিন্তু বাসন্তীতে তিনি কখনও আসেননি।"

"এমনি লোকজন নিশ্চয়ই ডক্টর সান্যালের কাছে আসেন? মানে গবেষণা টবেসনার ব্যাপারে? "

"আসেন। কালেভদ্রে। তাঁদের সঙ্গে কাজকর্ম নিয়ে আলোচনাও হয়। বোধহয় তাঁরা গভর্নমেন্টের লোক। এসে দিনভর থাকেন, খাওয়াদাওয়া হয়, মিটিং চলে...। ও হ্যাঁ, মাসদুই আগে তিনজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। বেশিক্ষণ থাকেননি। কী নিয়ে যেন স্যারের সঙ্গে কথাবার্তা হল, তারপর তাঁরা চলেও গেলেন। তবে স্যার তাঁদের খুব পছন্দ করেননি, বেশ বিরক্তই হয়েছিলেন।"

পার্থ বলল, "হয়তো ইন্টারভিউ টিন্টারভিউ নিতে এসেছিল। ডক্টর সান্যাল হয়তো ওসব পছন্দ করেন না।"

"হতেও পারে।" পার্থকে ঝলক দেখে নিয়ে মিতিন ফের নীলাম্বরের সঙ্গে গল্পে মেতেছে, "এই বাড়ি তো দেখছি সম্প্রতি রং করা হয়েছে..."

"ওই তো, লোকগুলো যাওয়ার পরপরই স্যারের হঠাৎ ঘরদোরের দিকে নজর পড়ল। সারাইটারাইও করলেন কিছু। ল্যাবরেটরিতে আর একটা এগজ়স্ট লাগালেন। রংটং শেষ হওয়ার পর স্যারের মেজাজ যখন একটু ফুরফুরে, তখনই হঠাৎ রজারের ওই কাণ্ড।"

"মানে, তোমাদের ডোবারম্যানটার হারিয়ে যাওয়া?"

"হারিয়ে নয়, বলুন উবে গেল। ওইরকম একটা বাঘা কুকুর...! রজারের আতঙ্কে এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় কেউ ঘেঁসত না। আমি যখন প্রথম কাজে এলাম, রজার তখন এতটুকু। বয়স সবে তিন মাস। সেই কুকুর কেমন ধাঁইধাঁই করে প্রকাণ্ড হয়ে গেল। চেনে বেঁধে নিয়ে বেরোলে ও আমায় টানছে, না আমি ওকে, বুঝতে পারতাম না।"

"রজার তোমারও খুব প্রিয় ছিল নিশ্চয়ই?"

"মায়া তো পড়বেই দিদি। আমরা তিনজনই তো বাস করতাম

বাড়িতে। যদি না অবশ্য স্যারের সাপ আর ইঁদুরগুলোকে গুনতিতে ধরেন," নীলাম্বরের গলা যেন একটু দুলে গেল, "আহা, কী প্রভুভক্তই না ছিল রজার। স্যার হয়তো অনেক রাত অবধি কাজ করছেন... আমি শুয়ে পড়লাম... রজার কিন্তু ঠায় বসে আছে স্যারের পায়ের কাছে। স্যার খেতে বসতে হয়তো দেরি করছেন, গিয়ে স্যারের অ্যাপ্রন ধরে টানাটানি করবে! পুরোপুরি মানুষের মতো বুদ্ধি। সব বুঝত। বুঝিয়েও দিত। শুধু কথাটাই যা বলতে পারত না। একবার মঙ্গলমেসো নাতিকে নিয়ে এসেছিল..."

"মঙ্গলমেসোটা আবার কে?"

"তাও তো বটে। আপনারা তাকে চিনবেন কী করে?" নীলাম্বর দাঁত বের করে হাসল, "আমার মায়ের খুড়তুতো বোনের বর। সুধন্যখালিতে থাকে। মেসোই তো আমাকে এ-বাড়িতে কাজে দিয়েছে। মেসো খুব ভাল সাপ ধরতে পারে। স্যারকে সাপ তো মঙ্গলমেসোই সাপ্লাই দেয়। মাসে একবার এসে বিষও বের করে দিয়ে যায় সাপের। মঙ্গলমেসো এমন সুন্দর সাপ বশ করতে জানে..."

"মঙ্গলমেসোর কথা পরে শুনব। তার নাতির কথা কী বলছিলে?"

"ও হ্যাঁ, গোপাল। তাকে তো রজার আগে কখনও দেখেনি... গেট দিয়ে সে ঢোকামাত্র ঘাঁউ করে তার কবজি কামড়ে ধরেছে...। গোপাল তারস্বরে কাঁদছে, মঙ্গলমেসো চেঁচাচ্ছে, আমি রজারকে ধমকাচ্ছি, টানাটানি করছি,.. রজার ছাড়বেই না। স্যার তখন শুধু দরজায় এসে একবার বললেন, 'রজার, লিভ হিম!' ব্যস, ওমনই রজার সুড়সুড় করে সরে গেল। এমন বাধ্য কুকুর উধাও হয়ে গেলে স্যারের মনখারাপ হবে না, বলুন? স্যার ছাড়া রজারের চলত না, রজার ছাড়া স্যারের। ছোট থেকে তো স্যারের

কাছেই শুত। এই তো, বাড়ি সারাইয়ের সময় থেকে রাতে ঘরের বাইরে থাকা শুরু করল। কম্পাউন্ডে চরকি দিত রাতে। স্যারই হুকুম করেছিলেন, 'যা ব্যাটা, তুই লায়েক হয়ে গিয়েছিস। এবার থেকে নাইট ডিউটি দে।' তা কে জানত, সেই রাতপাহারা দিতে গিয়েই রজার...। সেদিনটা আবার ছিল অমাবস্যা। ঘোর অন্ধকার..."

মিতিনের সঙ্গে বেশ জমে গিয়েছে নীলাম্বর। টুপুর লক্ষ করছিল, পার্থমেসোও শুনছে মন দিয়ে। কিন্তু অনিশ্চয় আঙ্কল অধৈর্য ক্রমশ। বারবার ঘড়িতে চোখ, ঘনঘন ফিরে তাকাচ্ছেন দরজার দিকে। কপালে বিরক্তির ভাঁজ মোটা হচ্ছে।

হঠাৎই নীলাম্বরকে দাবড়ে উঠলেন অনিশ্চয়, "এই যে, তোমাদের রজারের ঝাঁপিটা এবার বন্ধ করো তো। আমরা কাজের মানুষ, বিস্তর দূর ফিরতে হবে। দয়া করে দেখে এসো, তোমার স্যারের দর্শন দেওয়ার অবকাশ হল কিনা!"

হকচকিয়ে দৌড় লাগিয়েছে নীলাম্বর। সঙ্গেসঙ্গে অনিশ্চয়ের কণ্ঠেও বিদ্রুপ ধ্বনি, "হুঁঃ, যত্ত সব। সাধুবাবাদের দরজাতেও এতক্ষণ হত্যে দিতে হয় না।"

মিতিন হেসে ফেলল, "রজার হারানোটা কি আপনার ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না মজুমদারসাহেব?"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কী হতে পারে রজারের? কেউ কিডন্যাপ করেছে?"

"আর হাসিও না টুপুর। কে করবে কিডন্যাপ? এক সুন্দরবনের কোনও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যদি পয়সার লোভে কনট্রাক্ট নেয়, তো অন্য কথা," অনিশ্চয় ফেটে পড়লেন, "কোনও মানুষের পক্ষে ওই বাছুরের সাইজের ওয়াচডগকে কবজা করা ইমপসিবল।"

মিতিন বলল, "যদি কেউ ঘুমের ইঞ্জেকশন ঠুসে দেয়? বাঘটাঘকে যেভাবে ঘুম পাড়ানো হয় আর কী।"

"কিন্তু অপহরণ করার তো একটা কারণ থাকবে।" পার্থ বলে উঠল, "কুকুরের জন্য র‍্যানসম দাবি! এখনও তো শুনিনি!"

টুপুর বলল, "তা হলে ডক্টর সান্যালের আশঙ্কাটাই ঠিক। রজারকে কেউ মেরেই ফেলেছে। বিষ ইঞ্জেকশন দূর থেকে শুট করে ..."

"রিভলভারে সাইলেন্সার লাগিয়েও ট্রিগার টেপা যায়।"

"কিন্তু মারলটা কে? বডিটাই বা গেল কোথায়?"

"অনেকেই সন্দেহের তালিকায় আসতে পারে।" পার্থ চোখ নাচাল, "ফার্স্ট সাসপেক্ট, মঙ্গল। মোটিভ, নাতিকে কামড়ানোর বদলা। সাসপেক্ট টু, কোনও চোর বা ডাকাত। পাঁচিল টপকে রজারের মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে ব্যাটাকে নিকেশ করে দিয়েছে। তিন নম্বর সাসপেক্ট, এতক্ষণ ধরে কাঁদুনি গাওয়া নীলাম্বর বিশ্বাস স্বয়ং। রজার হয়তো তার কোনও কুকর্মে বাধা সৃষ্টি করছিল। আর বডি পাচার করা এখানে তো কোনও সমস্যাই নয়। বস্তায় পুরে টানতে টানতে নিয়ে পুরন্দরের খালে ফেলে দিলেই কাম ফতে। বিদ্যাধরী বা মাতলা নদীতে বিসর্জন দিলেই বা ঠেকায় কে! কুমির-কামটদেরই পোয়াবারো হবে, ফোকটে নেমন্তন্ন জুটে যাবে একটা।"

"তোমার থিয়োরিতে প্রচুর গলদ আছে। বিশেষ করে মোটিভগুলো নিয়ে," মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "মঙ্গল তো একেবারেই অ্যাবসার্ড। দ্বিতীয়ত, চোর-ডাকাত রজারকে মারলে চুরি-ডাকাতির একটা চেষ্টা হতই। হয়েছে কি? তা ছাড়া রজারের মৃতদেহ তারা সরিয়েই বা ফেলবে কেন?"

"ওফ, আপনারা গবেষণা থামাবেন?" অনিশ্চয়ের গলা গমগম

বেজে উঠল, "দেখুন ম্যাডাম, রজার চুরি হোক, কী খুন, আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড। যাঁর সন্ধানে আসা, তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করে এখন মানেমানে কেটে পড়তে পারলে বাঁচি।"

অনিশ্চয়ের শেষ বাক্য তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। দরজায় এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। ডক্টর সুমন্ত্র সান্যাল।

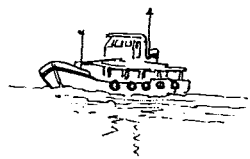

"কুকুরটাকে হারিয়ে আমি বড্ড বেশি আনমাইন্ডফুল হয়ে গিয়েছি আই জি সাহেব। মাথা সবসময় নর্মালি কাজ করছে না।"

"তা বলে একটা ইন্টিমেশন পর্যন্ত না দিয়ে দুম করে ঘাটশিলা চলে যাবেন?"

"এখন টের পাচ্ছি, কাজটা গোখ্‌খুরি হয়ে গিয়েছে। বিশ্বাস করুন, এত শোরগোল পড়ে যাবে ভাবিনি। মিছিমিছি আপনাদেরও হয়রানির একশেষ।"

চিঁড়ে ভিজল না। অনিশ্চয় গাল ফুলিয়ে বললেন, "জানেন, আর-একটু হলে আপনার কেসটা সি বি আই পর্যন্ত গড়াত?"

"আমার মতো একজন নগণ্য মানুষের জন্য সি বি আই?" সুমন্ত্র সান্যালকে কেমন যেন বিহ্বল দেখাল, "আমি এতই সমস্যার সৃষ্টি করে ফেলেছিলাম? ছি ছি ছি, ভাবতেই খুব খারাপ লাগছে। আমি সত্যিই লজ্জিত আই জি সাহেব। আমার ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।"

টুপুর একদৃষ্টে ডক্টর সান্যালকে দেখছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞানী বলতে যে প্রাজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ছবি চোখে ভাসে, সুমন্ত্র যেন ঠিক সেই গোত্রের নন। বয়স

তো বেশ কম, পঁয়তাল্লিশও হবে কিনা সন্দেহ। রোগা, লম্বা দেহযষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাসিকাটিও বেখাপ্পা রকমের খাড়া। অনেকটা ধনেশপাখির ঠোঁটের মতো। ব্যাকব্রাশ চুল, চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা, চোয়াড়ে গাল নিখুঁত কামানো। গাত্রবর্ণ ঈষৎ তামাটে। তবে চোখের মণি দুটো কিন্তু দারুণ উজ্জ্বল। এত কালো মণি খুব কমই দেখা যায়।"

অনিশ্চয় সামান্য ঠান্ডা হয়েছেন। গুছিয়ে বসে বললেন, "তা হঠাৎ ঘাটশিলায় গা ঢাকা দিলেন কেন?"

সুমন্ত্র মৃদু হাসলেন, "লুকোব কেন? একটা গবেষণা সংক্রান্ত কাজেই ..."

"কাইন্ডলি যদি একটু ডিটেলে বলেন! আমাকে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে তো।"

"আমি তো সকালে একবার এখানকার ও সি-কে বলেছি। শুক্রবার আমার একটা সেমিনার ছিল। ওখানেই হঠাৎ খবর পাই, ঘাটশিলা অঞ্চলের এক স্পেসিফিক উপজাতির লোকেরা স্নেক ভেনমের সঙ্গে কয়েকটা জংলি গাছগাছড়ার রস মিশিয়ে একটা পিকিউলিয়ার মেডিসিন তৈরি করে। যে-কোনও ধরনের আলসার সারাতে ওষুধটা নাকি অব্যর্থ। শুনেই কী যে হল, সেমিনার থেকে সোজা হাওড়া স্টেশন।"

"সেমিনারটা কোথায় হচ্ছিল জানতে পারি?"

"ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল টেকনোলজির অডিটোরিয়ামে, যাদবপুরে।"

"কতক্ষণ ছিলেন সেখানে? মানে, যদি আপনার বলতে আপত্তি না থাকে!"

"আমি অডিটোরিয়াম ছাড়ি অ্যারাউন্ড ফোর।"

"তার মানে স্টিল এক্সপ্রেস ধরেছিলেন?"

"হুঁ।"

"তার পর বেমালুম ঘাটশিলাতেই রয়ে গেলেন পাঁচ দিন?"

"প্রপার টাউনে নয়। ইন্টিরিয়রে যেতে হয়েছিল। যদুগোড়ার দিকটায়।"

"ও। ওখানে আপনার মিসিং হওয়ার খবরটা পেলেন কবে?"

"পাইনি তো। কাল বাসন্তীতে ফিরে শুনলাম।"

"তো, কালই তো আপনার থানায় ইনফর্মেশনটা দেওয়া উচিত ছিল।"

"বড্ড টায়ার্ড ছিলাম। প্লাস ভাবলাম, এসেই তো পড়েছি। রাতেও খবর দেওয়া যা, সকালেও তাই।"

পার্থ ফস করে জিজ্ঞেস করল, "তা ঘাটশিলাতে আপনার কাজ হল?"

"কই আর। চার-পাঁচ রকম ট্রাইবের সঙ্গে কথা বললাম। তারা কেউ ওসব জানেই না। স্রেফ গুজব ধাওয়া করে আমার চার-পাঁচটা দিন চলে গেল। সময়ের কী অপচয়!"

মিতিন চুপচাপ শুনছিল। অনেকক্ষণ পর কথা বলল, "আপনি তো এখানে একাই থাকেন, তাই না?"

"হ্যাঁ। আমার স্ত্রী আর মেয়ে স্টেটসেই রয়ে গিয়েছে। বস্টনে। আমার স্ত্রী বস্টন ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিয়ান। মেয়ে স্কুলের শেষ ধাপে।"

"একটু ব্যক্তিগত হয়ে যায়, তবু একটা প্রশ্ন করব? ওঁদের রেখে আপনি চলে এলেন কেন?"

"আমার কাজটা আমি আমার দেশের মাটিতেই করতে চাই। পড়াশোনা করতে ওদেশে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার মগজ নিয়ে অন্য একটা দেশ ব্যবসা করবে, এ আমার কখনওই অভিপ্রেত ছিল না। প্রথম সুযোগেই তাই ফিরে এসেছি।"

"আপনি ভারত সরকারের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত, তাই না?"

"উঁহু, যুক্ত নয়। প্রকল্পটা আমারই। প্ল্যান, প্রোগ্রাম, এস্টিমেট করে আমিই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। আমার সৌভাগ্য, আমাকে সামান্যতম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। গভর্নমেন্ট আমায় সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সো, মিশিগান ইউনিভার্সিটি ছেড়ে আমি স্ট্রেট এখানে।"

"কিন্তু আপনার স্ত্রী আর মেয়ে বোধহয় আসতে রাজি হলেন না?"

"কী আর করা। আমেরিকান লাইফস্টাইলের সঙ্গে ওরা এমনভাবে মিশে গিয়েছে, ওদের পক্ষে আর ইন্ডিয়ায় এসে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। বারদুয়েক ঘুরে গিয়েছে এখানে। তারপর ওই উইকলি ফোন অথবা ই-মেল ...।"

"আপনার লোনলি লাগে না?"

"কাজের মধ্যে থাকলে নিজেকে একা ভাবার ফুরসত কোথায়!"

অনিশ্চয় বললেন, "আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করব? ভারতবর্ষে এত জায়গা থাকতে সুন্দরবন আপনার পছন্দ হল কেন? স্নেক-ইনফেস্টেড এলাকা বলে?"

"সেটা একটা মেজর কারণ বটে। আমার পয়জনাস স্নেকের কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই চাই। সেদিক দিয়ে সুন্দরবন তো আইডিয়াল। তা ছাড়া আমি খানিকটা নিরিবিলিও খুঁজছিলাম। নিজের মনে কাজ করব, কেউ ডিস্টার্ব করবে না, কোনওরকম মিডিয়ার উৎপাতও থাকবে না ...। কলকাতা ফিরে বাসন্তীর এই বাড়িটার সন্ধানও পেয়ে গেলাম। ঘেরা বাড়ি, অনেকটা জমি, ঠিক যেমনটা আমি চাই। ইচ্ছে হলে ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে কলকাতাও রিচ করতে পারব, আবার নয়েজ়ি কলকাতা রিচের একটু বাইরেও থাকবে।"

"কলকাতায় তো মাঝেমাঝেই যান, নাকি?"

"যাই। মাসে এক-আধবার। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে জার্নালটার্নাল ঘাঁটতে। কিংবা কেমিক্যাল রি-এজেন্টের অর্ডার দিতে।"

"গেলে নিশ্চয়ই আত্মীয়স্বজনের বাড়িতেই ওঠেন?"

"না। ইউজুয়ালি নাইট হল্ট করি না। স্টে করলে গভর্নমেন্টের গেস্টহাউজেই থাকি। ওই যে, আপনাদের ঢাকুরিয়া লেকের গায়ে।"

"কেন? আত্মীয়স্বজন বুঝি আপনার পছন্দ নয়?"

"ঠিক তা নয়। নিয়ার রিলেটিভ কেউ নেই তেমন কলকাতায়।"

"আপনার ভাই থাকেন না কলকাতায়? নীলাম্বর বলছিল...?"

"বলছিল বুঝি?" সুমন্ত্র আলগা হাসলেন, "আমার ভাই প্রপার কলকাতায় কোনও দিনই থাকেনি। আর এখন তো সে চাকরির সূত্রে বাঙ্গালোরে," বলতে বলতে সুমন্ত্র অনিশ্চয়ের দিকে ফিরেছেন, "মোটামুটি সবরকম ইনফর্মেশন তো দিয়েই দিলাম। আশা করি, আপনার রিপোর্ট তৈরি করতে আর কোনও অসুবিধে নেই?"

অনিশ্চয় তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আরে না না, ওগুলো তো জাস্ট ম্যাডামের কৌতূহল। আপনার মতো একজন বিজ্ঞানীর সম্পর্কে ডিটেলে জানতে কার না ইচ্ছে করে, বলুন?"

নীলাম্বর ফের আপ্যায়নে হাজির। এবার চা। সঙ্গে অমলেট, চানাচুর, সন্দেশ।

পার্থ খুশিখুশি মুখে বলে উঠল, "এই দ্যাখো, আবার এসব করতে গেলেন কেন?"

সুমন্ত্র স্মিত স্বরে বললেন, "আমাকে এটুকু প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগও দেবেন না?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অমলেটে চামচ বসাল পার্থ। অনিশ্চয় কাপ তুলে নিলেন হাতে। চায়ে চুমুক দিচ্ছেন।

হাল্‌কা সুরে জিজ্ঞেস করলেন অনিশ্চয়, "আপনার রজারের শেষ পর্যন্ত কী হল কিছু অনুমান করতে পারলেন?"

সুমন্ত্র চোখ থেকে চশমা নামালেন। কাচ ঘষতে ঘষতে বললেন, "আবার কুকুরটার কথা মনে করিয়ে দিলেন তো? ওকে ছেড়ে থাকতে আমার কী যে কষ্ট...?"

"আপনার নাকি সন্দেহ রজারকে মেরে ফেলা হয়েছে?"

"না হলে অ্যাদ্দিনে তো একটা ট্রেস পাওয়া যেত, নয় কি?"

"কে মারতে পারে বলুন তো? লোকাল কোনও রাফিয়ান টাফিয়ান?"

"হতেও পারে। স্পেসিফিক বলতে পারব না। তবে আমি শিয়োর কুকুরটাকে কেউ মেরেই ফেলেছে।"

"আপনার উপর কারও রাগটাগ ছিল কি?"

"আমার উপর?" সুমন্ত্র অবাক, "আমি থাকি আমার কাজকর্ম নিয়ে..."

"বটেই তো। স্যার কারও সাতেপাঁচে থাকেন না...। তা ছাড়া পণ্ডিত মানুষ বলে এখানকার লোকেরা স্যারকে তো খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে।"

মিতিন পেয়ালা-পিরিচ হাতে উঠে পড়েছিল। কাচের আলমারিতে রাখা মোটামোটা বিজ্ঞানের বইগুলো দেখছিল মন দিয়ে। সেখান থেকেই বলল, "আচ্ছা ডক্টর সান্যাল, আমরা কি এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যেতে পারি?"

"কীরকম?"

"আপনার কাজটা তো ক্যান্সারের ওষুধ নিয়ে, তাই না?"

"হুম।"

"আপনি তো সাপের বিষ থেকেই...। ব্যাপারটা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। যদি একটু বুঝিয়ে বলেন..."

"ক্যান্সার রোগটা সম্পর্কে আপনার কোনও পরিষ্কার ধারণা আছে কি?"

"অল্পস্বল্প। যত দূর জানি, কারও কারও শরীরে নাকি অংকোজিন বলে এক ধরনের জিন থাকে। সেই জিনই নাকি, কোনও বিশেষ কারণে, কখনও কখনও শরীরের কোনও একটা অংশের কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়। মানে..."

"পার্শিয়ালি ঠিক বললেন। তবে কারও কারও নয়, আমাদের প্রত্যেকের দেহেই থাকে প্রোটো-অংকোজিন। সেই প্রোটো-অংকোজিন যখন অংকোজিনে পরিণত হয়, তখনই ক্যান্সারের আশঙ্কা দেখা দেয়। আমি চাইছি ওই প্রসেসটাকেই আটকাতে। অর্থাৎ আমার ওষুধ হবে ক্যান্সারের প্রতিষেধক। কলেরা বা বসন্তর টিকার মতো।"

"অসাধারণ!" পার্থর স্বরে তারিফ, "তার মানে ক্যান্সারের চান্সটাই আপনি নির্মূল করে দেবেন?"

"চেষ্টা করছি। প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দ্যান কিয়োর।"

"বটেই তো।" মিতিনের চোখেও মুগ্ধতা, "কিন্তু স্যার, সাপের বিষ থেকে সত্যিই কি তা বের করা সম্ভব?"

"কেন নয়?" সুমন্ত্র হাসলেন, "সাপের বিষ আদতে কী? একগাদা এনজাইম, আর খুব ঘন প্রোটিনের মিক্সচার। আমার কাজের ডিটেলে না গিয়েও আমি বলতে পারি, কোনও কোনও এনজাইমকে সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে পারলে প্রোটো-অংকোজিনকে নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব। অন্তত তার অংকোজিন হওয়ার প্রবণতাটাকে তো বিনষ্ট করা যায়ই। পদ্ধতিটা খুবই জটিল, তবে কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। কী, বোঝাতে পারলাম?"

"কিছুটা তো আইডিয়া হলই। কী মজুমদারসাহেব, হল না?"

অনিশ্চয় চোখ কুঁচকে শুনছিলেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "তা তো হল। কিন্তু এবার যে আমাদের উঠতে হয়।"

মিতিন উৎসুক মুখে বলল, "তার আগে একবার স্যারের ল্যাবরেটরিটা দেখব না?"

টুপুরও চাপা উত্তেজনায় ছটফট করছিল। মিনতির সুরে বলল, "আমি একটু সাপের ঘর দেখব। প্লিজ।"

সুমন্ত্র হাসিটাকে চওড়া করে বললেন, "খুব ইচ্ছে হচ্ছে? যাও তবে, নীলাম্বরের সঙ্গে ঘুরে এসো।"

অনিশ্চয়ের খুব একটা আগ্রহ নেই দেখার। জীবনে বহু সাপ নাকি দ্যাখা হয়ে গিয়েছে তাঁর। একবার পশ্চিমঘাট পর্বতে এক মরাঠি সাপের ছোবল খেয়েছিলেন। সাপটার নাম শুনলেই মনে হয় বেজায় রাগী। গরগর। তবে বিষটিস ছিল না, এই যা রক্ষে। সুমন্ত্র সান্যালের সঙ্গে সেই সর্পদংশনের গল্পে মেতে উঠলেন অনিশ্চয়।

টুপুররা পায়ে পায়ে ল্যাবরেটরিতে এল। বিশাল হলঘর। লম্বা লম্বা টেবিলে অজস্র কাঠের র‍্যাক। টেস্ট টিউব, ব্যুরেট, পিপেট, বিকার, ব্লো-পাইপ, জারে বোঝাই। দেওয়াল জোড়া কাচের আলমারি, ছোট বড় শিশি-বোতল আর পিচবোর্ডের বাক্সে ঠাসা। কত রঙের যে কেমিক্যাল! ঢাউস ঢাউস ফ্রিজ আছে তিনখানা, হাফ ডজন মাইক্রোস্কোপ। কাচে ঢাকা সোনালি বর্ণের ওজনযন্ত্রও আছে সারসার। আরও হরেক কিসিমের যন্ত্রপাতি। কোনওটা কাচের, কোনওটা বা ইস্পাতের, কোনওটা তামার। মিষ্টি আর কটু গন্ধের এক বিচিত্র মিশেল ম ম করছে ঘরের বাতাসে। একধারে ছোট্ট পার্টিশন, তার ওপারে কম্পিউটার। রয়েছে একখানা ঢাউস সেক্রেটারিয়েট টেবিলও। বই, কাগজপত্র আর ফাইলের স্তূপ সেখানে। টেবিলের পিছনে খুদে দরজা, ভিতরে ছোটখাটো একটা গ্যাসপ্ল্যান্টও দ্যাখা যায়। প্ল্যান্ট থেকে পাইপ বেরিয়ে টেবিলের বার্নারগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বোঝাই যায় বড়সড় কর্মযজ্ঞ চলছে গবেষণাগারে।

ঘুরতে ঘুরতে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা নীলাম্বরদাদা, সাপের বিষ কি ফ্রিজে রাখতে হয়?"

নীলাম্বর পার্থকে কী যেন দ্যাখাচ্ছিল। ফিরে বলল, "অবশ্যই। নইলে বেশিদিন গুণ থাকবে না যে! তবে ফ্রিজে ঢোকানোর আগে স্যার বিষটাকে জমিয়ে ছোট ছোট দানা করে নেন।"

"ওষুধ বুঝি ওই দানা থেকেই তৈরি হবে?"

"শুধু কি দানা! কত কী করতে হবে। পরিমাণ মতো জলে দানা গুলতে হবে। তার সঙ্গে নানা কেমিক্যাল মিশবে। তারপর মিক্সচার ফোটাও, ঠান্ডা করো, ঝাঁকাও, সেন্ট্রিফিউজে ঘোরাও, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঘড়ি ধরে তাকে থার্মোস্ট্যাটে রাখো... সে ভারী জটিল ব্যাপার।"

"সব কাজ স্যার একাই করেন?"

"আমিও হাত লাগাই। সময় মেপে ফোটানো, এটা-ওটা ওজন করে মেশানো, পি এইচ মাপা...। স্যার যেভাবে বলেন, সেভাবেই সলিউশন বানাই।"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "তুমি লেখাপড়া কত দূর করেছ, নীলাম্বর?"

"আজ্ঞে, সায়েন্স নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছিলাম। সেকেন্ড ডিভিশনে। অভাবের তাড়নায় কলেজে যেতে পারিনি। আমাকে তো স্যার প্রথমে ল্যাবরেটরির জন্যই কাজে নিয়েছিলেন। ঘরের কাজকর্ম, রান্নাবান্না, ওসব তো এখানকার মেয়েলোকেরাই করত। কিন্তু টিকতে চাইত না কেউ।"

"কেন?"

"প্রথমত, রজার। তার সঙ্গে সাপের ভয়। ঘনঘন লোক পালানো দেখে আমিই একদিন স্যারকে বললাম, 'আপনি আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, এই নীলাম্বরই সব সামলে দেবে। ভারী তো দুটো লোকের রান্না আর ঘর ঝাড়পোঁছ! ঘরে অটোমেটিক মেশিন থাকলে ওগুলো আবার কাজ নাকি!' স্যার মিক্সি, মাইক্রোওয়েভ আভেন,

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, বাসন ধোওয়ার যন্ত্র, ইস্ত্রি, হিটার, কী না এনেছেন বিদেশ থেকে। কাজের মেয়েরা থাকতে দামি জিনিসগুলো পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল।"

কথা শুনতে শুনতেই টুপুরের চোখ গিয়েছে দেওয়ালে, "ল্যাবরেটরিতে ফোল্ডিং মই কেন? এখানে মই কী কাজে লাগে?"

"ওটা নতুন কেনা হয়েছে। রাজমিস্ত্রিরা যখন সারাইটারাই করছিল, তখন," নীলাম্বর ফিক করে হাসল, "মই বেয়ে উঠে এবার থেকে স্যার নাকি নিজেই এগজস্ট পরিষ্কার করবেন। খেয়াল!"

নীলাম্বরের সঙ্গে বকবক করতে করতে গবেষণাগার ছেড়ে টুপুররা বাড়ির পিছনভাগে। বাঁধানো চাতাল পেরোলে একফালি ঘাসজমি। শুকনো শুকনো মাঠটুকুর প্রান্তে, পাঁচিলের প্রায় লাগোয়া, একখানা পাকা ঘর। মেন বিল্ডিংয়ের মতো পুরনো নয়। সম্ভবত সুমন্ত্র সান্যালেরই বানানো।

ঘরটায় তালা ঝুলছিল। দরজা খুলে নীলাম্বর চাপা স্বরে ডাকল, "আসুন।"

ঢুকেই টুপুরের গা ছমছম। কী স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার রে বাবা। ঘুলঘুলি আর দরজা দিয়ে যেটুকু আলো আসছে, তাতে সবই কেমন আবছা আবছা। ঘরখানা বেশ ঠান্ডাও। দেওয়ালময় সারসার কাচের খাঁচা। সাপদের আস্তানা! একটা অস্পষ্ট আওয়াজও শোনা যায় যেন! হিস্‌স্‌স্‌! হিস্‌স্‌স্‌!

টুপুর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "ওটা কীসের শব্দ গো মিতিনমাসি?"

"চন্দ্রবোড়া," নীলাম্বরই আগ বাড়িয়ে উত্তর দিল, "ওরা সারাক্ষণই এরকম শব্দ করে।"

"কিন্তু সাপটা কোথায়? এই অন্ধকারে দেখা যাবে?"

নীলাম্বর ঘরের একমাত্র বাতিখানা জ্বেলে দিল। বড় বাল্‌বের

আলোয় চতুর্দিক এখন মোটামুটি দৃশ্যমান। এই তো সাপগুলো! প্রায় প্রতিটি ঘরেই এক জোড়া করে। কেউ বা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে, কেউ শরীর ছেড়ে রেখেছে খড়ের বিছানায়। কোনও কোনও খাঁচায় মাটি লেপা। কোথাও বা বালি। কোনও ঘরে শুধুই পাথর।

মিতিন একখানা কাচের বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "ওই দ্যাখ টুপুর, ওই তোর চন্দ্রবোড়া।"

টুপুর স্থির। সত্যিই দেখবার মতো চেহারা। হাততিনেকের বেশি লম্বা নয় বটে, তবে বেশ নধরকান্তি। রং সোনালি আর বাদামির মাঝামাঝি। গায়ে বড়বড় কালচে ছোপ, যেন কোনও শিল্পীর তুলিতে আঁকা। একজন ঘুমোচ্ছে, অন্য জন ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্লথ গতিতে। অলস পাহারাদারের মতো। উঁকি দিচ্ছে চেরা জিভ, মিলিয়ে যাচ্ছে পরমুহূর্তে।

নীলাম্বর বলল, "এরা কিন্তু পুরোদস্তুর জোয়ান। বয়স প্রায় আড়াই বছর।"

"সাপ বাঁচে কত দিন?"

"ঝোপেঝাড়ে বনেজঙ্গলে নিজের মতো ঘুরে বেড়াতে পারলে বিশ-পঁচিশ বছর। তবে এই বদ্ধ জায়গায় বছর চার-পাঁচের বেশি টেকে না।"

আহা রে, বন্দি থাকার দুঃখে আয়ু কমে যায়? টুপুরের সাপগুলোর জন্য ভারী মায়া হল। তবে মানুষের উপকারে লাগছে, এও বড় কম কথা নয়!

চন্দ্রবোড়ার পাশে গোখরোর বাড়ি। দৈর্ঘ্যে চন্দ্রবোড়ার মতোই, তবে এরা বেশ ছিপছিপে। চওড়া মাথা, ফণায় দুটো গোল গোল দাগ। দেখে মনে হয় চশমা পরে আছে। শঙ্খচূড় জুটি তো রাজারানির মেজাজে শুয়ে। চমৎকার স্বাস্থ্য, লম্বাতেও কিছু না হোক

ফুটদশেক তো হবে। তুলনায় গেছোবোড়া কিংবা বংকোরাজ নেহাতই খুদে। গেছোবোড়ার রং শ্যামলা। বংকোরাজ বাদামি। চিতিসাপের গাত্রবর্ণ ইস্পাতনীল, সাইজ কেউটে-গোখরোর কাছাকাছি। তবে সবচেয়ে সুন্দর বুঝি শঙ্খিনী। কুচকুচে কালোর উপর চওড়া চওড়া হলদে ডুরে। তেল-চকচক চামড়ায় রং যেন পিছলোচ্ছে। এই গোত্রের সাপ কি আগে চিড়িয়াখানায় দেখেছে টুপুর?

পার্থ আর নীলাম্বরের কথা চলছে টুকটাক। জ্ঞান ভাণ্ডার বাড়াচ্ছে পার্থ।

"কোন সাপের বিষ সবচেয়ে মারাত্মক গো নীলাম্বর?"

"কেউ কারও চেয়ে কম যায় না দাদা। কেউটে, গোখরো, চিতি, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড় সবাই তুল্যমূল্য। তবে শঙ্খচূড় সাইজে বড় তো, তাই একবারে বেশি বিষ ঢালতে পারে।"

"কোন বয়স থেকে বিষ আসে সাপের?"

"বিষধর সাপ জন্ম থেকেই বিষধর। ছোট অবস্থায় বিষের পরিমাণটা কম থাকে, এই যা।"

"কেউটে কামড়ালে নাকি ঘুম পায় খুব?"

"হ্যাঁ দাদা। আর চন্দ্রবোড়ার বিষে শরীরে জ্বালাপোড়া ধরে। স্যার যখন ইঁদুরদের চন্দ্রবোড়ার বিষ ইঞ্জেকশন দ্যান, ইঁদুরগুলো যা ছটফট করে না!"

"তোমাদের ইঁদুরগুলো কোথায়?"

"খাঁচায় আছে। ল্যাবরেটরির ওপাশের ঘরটায়। যাবেন দেখতে?"

"থাক গে। আমার বউবাজারের প্রেসে যথেষ্ট ধেড়ে ইঁদুর দেখি রোজ। ...তা তোমাদের সাপেরা খায় কী?"

"দুধ, আরশোলা, টিকটিকি, পোকামাকড়। বর্ষাকালে ব্যাং এনে দিই। চিতিসাপের জন্য হেলে সাপও ধরে আনা হয়।"

"কে দেয় খাবার? তুমি? না স্যার?"

"আমিই দিই।"

"ভয় করে না?"

"প্রথম প্রথম লাগত। তারপর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া সাপ যদি ফণা তোলে, তা হলে কীভাবে তাকে ঘায়েল করতে হবে, সে কায়দাও মঙ্গলমেসো আমায় শিখিয়ে দিয়েছে।"

"তোমার মঙ্গলমেসো কদ্দিন পর পর সাপ দিতে আসেন?"

"সাপ আর বছরে ক'টাই বা কেনা হয়! মঙ্গলমেসো তো আসে বিষ বের করতে। মাসে একবার তো বটেই। এ মাসে সময় হয়ে গিয়েছে, আজ-কালের মধ্যেই আসবে।"

"বলো কী? প্রত্যেক মাসে বিষ বের করতে হয়?"

"হ্যাঁ। বেরিয়ে গেলে আবার এক মাসের মধ্যেই সাপের থলিতে বিষ জমে যায়। এই গরমকালে বিষ পাওয়া যায় পরিমাণে বেশি। তবে শীতের বিষ কিন্তু অনেক অনেক কড়া। স্যার বলেন।"

টুপুর হাঁ করে শুনছিল কথাগুলো। মিতিনও। হঠাৎই বাইরে অনিশ্চয়ের গলা, "কী হল, আপনারা যাবেন না? এরপর কিন্তু বাড়ি পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে। আমার মানিকচাঁদকে কিন্তু সন্ধের পর তিরিশের বেশি স্পিড তুলতে দেব না!"

সাপের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সকলে। নীলাম্বর তালা লাগাচ্ছে দরজায়।

পার্থ হালকা সুরে বলল, "দারুণ জিনিস মিস করলেন কিন্তু আই জি সাহেব। এত ভ্যারাইটির বিষধর সাপ চিড়িয়াখানার বাইরে সচরাচর মেলে না।"

"আমাদের লকআপে মশাই অনেক বেশি ভ্যারাইটির সাপ আসে।" অনিশ্চয় পালটা ঠাট্টা জুড়লেন, "আমাকে তো শুধু ফুর্তির

প্রাণ গড়ের মাঠ করলে চলবে না। একটা কাজের কাজ সারতে হল। ঝটাপট রিপোর্ট বানিয়ে, সুমন্ত্রবাবুকে শুনিয়ে, কাউন্টার সাইন করিয়ে, একটা কপি ভদ্রলোকের হাতে ধরিয়ে দিয়েছি। এবার গিয়ে মিনিস্টারের টেবিলে কাগজটা পাঠিয়ে দেব। ব্যস, আমি দায়মুক্ত। শুধু বাসন্তী থানাটাই যা বাকি। ওদের একটু না রগড়ালে ঠিক সুখ হচ্ছে না, বুঝলেন!"

"চলুন তবে। কেন আর মন খুঁতখুঁত থাকে!"

সুমন্ত্র সান্যালের বাড়ি থেকে রওনা দেওয়ার আগে মিতিন জনসংযোগ সেরে নিল। ভ্যানিটিব্যাগ থেকে তার 'থার্ড আই'-এর ভিজিটিং কার্ড বার করে ধরিয়ে দিল সুমন্ত্রকে। জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকা নীলাম্বরকেও বঞ্চিত করল না।

কার্ডে চোখ বুলিয়ে সুমন্ত্র ভদ্রতা করে বললেন, "থাক কাছে। কাজে তো লাগতেও পারে। ... আর আই জি সাহেব, আপনার ফোন নম্বরটা.... ?"

"আপনার কাছে আছে তো। রজারের ব্যাপারে ফোন করেছিলেন না?"

"ও হ্যাঁ, তাও তো বটে।"

"তা হলে ওই কথাই রইল? এবার নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে আমাকে একটা ফোন করে যাবেন! হা হা হা।"

বেলা পড়ে গিয়েছে। রোদ্দুরের আর ঝাঁঝ নেই তেমন। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে গাছগাছালি। গেটের বাইরে এসে পার্থ বলল, "বেড়ে কাটল কিন্তু দিনটা।"

"সে আর বলতে!" অনিশ্চয়ের মেজাজও সরেস, "নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, অপহৃত বিজ্ঞানীর সশরীরে প্রত্যাবর্তন, বাসন্তী ভ্রমণ..."

"তারপর ধরুন সর্পদর্শন!" বলেই পার্থ দাঁড়িয়ে পড়েছে। মিতিন

কিছুটা পিছিয়ে, হাতে কী একটা নিয়ে যেন দেখছে চোখ কুঁচকে। পার্থ জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী?"

"একটা লোকাল ট্রেনের টিকিট। মল্লিকপুর থেকে ক্যানিং।"

"কুড়িয়ে পেলে?"

মিতিন জবাব দিল না। অন্যমনস্ক মুখে টিকিটটা রেখে দিল ব্যাগে।

খানিক আগে জোর একটা কালবৈশাখী হয়ে গেল। উথালপাথাল বাতাস, চোখজ্বালানো ধুলোর ঝড়, চিড়িক চিড়িক আকাশচেরা বিদ্যুৎ, কানফাটানো মেঘগর্জন, আর তার পিছুপিছু ঝমঝমাঝম বৃষ্টি। বেশিক্ষণ নয়, বড়জোর আধঘণ্টা। তাতেই দিনমানের গনগনে তাপ বেবাক উধাও।

বৃষ্টি থামার পরপরই প্রেস থেকে ফিরল পার্থ। দরজা খুলেই টুপুর হেসে খুন। এ কী কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি হয়েছে পার্থমেসোর! ছ্যাদরাব্যাদরা চুল, মাথা বেয়ে জল গড়াচ্ছে, শার্ট-প্যান্ট ভিজে লেপটে গেছে গায়ে! পুরো ভেজা কাকের মতো হাল!

টুপুর হাসতে হাসতে বলল, "এ মা, এত ভিজলে কেন? কোথাও দাঁড়িয়ে যেতে পারতে।"

"বলে লাভ নেই টুপুর।" মিতিন পিছন থেকে ফোড়ন কাটল, "তোর মেসো খুব বীরপুরুষ। বৃষ্টি নামলে রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে হাঁটতে ভালবাসে। তারপর বাড়ি ফিরেই হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো। এবং মুড়িসুড়ি দিয়ে বিছানায়।"

পার্থ হেসে বলল, "আহা, সে সৌভাগ্য কি এবারও হবে? জ্বরে পড়ে সোমবার পর্যন্ত যদি লেটে থাকতে পারি..."

"তা হলে সেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ছেলেগুলোকে তিন দিন আরও ঠেকিয়ে রাখা যায়, তাই তো?"

"এই যাঃ! টিকটিকির নাক ঠিক মতলবটার গন্ধ পেয়ে গিয়েছে! ...কী করি বলো, কম্পোজিটারবাবুর আজও পাত্তা নেই। সারাদিন তো তার পথ চেয়েই বসে ছিলাম।"

"বুঝেছি। যাও, এখন ভাল করে স্নান সেরে নাও। আর কাদামাখা জামাকাপড়গুলো বাথরুমে ফেলে রেখো না। ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে দিয়ো দয়া করে।"

মিনিটদশেকের মধ্যে পার্থ ফুলবাবুটি হয়ে ডাইনিং টেবিলে হাজির। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, চুলটুল আঁচড়ে। চেয়ারে বসে হাত ঘষতে ঘষতে বলল, "বেশ জম্পেশ একটা খাওয়াদাওয়া চলছে মনে হচ্ছে?"

"ইয়েস। গরমাগরম আলুর চপ, পেঁয়াজি, আর পাফ্‌ড রাইস। সাহেবের কি মুড়ি চলবে?"

"সঙ্গে একটা কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যাবে কি? আর দো বুঁদ আচারের তেল?"

"মিল যায়গা।"

ব্যস, সান্ধ্য আসর জমজমাট। এ-কথা ও-কথা থেকে উঠে এল গতকাল বাসন্তী ভ্রমণের প্রসঙ্গ। টুপুর আপশোস করে বলল, "কাল কিন্তু আমাদের একটা জিনিস মিস হয়ে গেল।"

পার্থ পেঁয়াজিতে কামড় বসিয়ে বলল, " কী রে?"

"বাসন্তীর চার্চটা। সামনে দিয়ে এলাম গেলাম, অথচ একবার ঢোকা হল না।"

"কী আর নতুন দেখতিস? বড়জোর কয়েকটা পেন্টিং, তাও

তেমন কিছু হয়তো দরের হবে না। আর কিছু রঙিন কাচের কারুকাজ। যা কলকাতার গির্জায় আকছার দেখা যায়। আমাদের এখানে সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালে যা আছে, তার তুলনায় ও তো নস্যি।"

মিতিন বলল, "অত হেলাফেলা কোরো না। মনে রেখো, সুন্দরবনের প্রত্যেকটা গির্জারই একটা ইতিহাস আছে। সুন্দরবন একসময় ছিল জলদস্যুদের আড্ডা। পর্তুগিজ হার্মাদরা জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে ওই অঞ্চলের নদীতে-নদীতে চরে বেড়াত। যাত্রীবোঝাই কিংবা কোনও মাল-ভরতি নৌকো তাদের নজরে এলে আর রক্ষে নেই। সর্বস্ব তো কেড়ে নিতই, সামান্যতম বাধা পেলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিত। এই হার্মাদদের বসতির ধ্বংসাবশেষ এখনও সুন্দরবনের দ্বীপগুলোতে পাওয়া যায়। এদের উৎপাত একসময় এত বেড়েছিল, দিল্লির মুঘল বাদশাহরা পর্যন্ত ওদের টিট করতে ফৌজ পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল।"

পার্থ বলল, "তুমি কি বলতে চাও বাসন্তীর চার্চও হার্মাদদের তৈরি?"

"তা ঠিক জানি না। তবে পর্তুগিজ জলদস্যুরা বেঙ্গলে বেশ কিছু গির্জা বানিয়েছিল। তার মধ্যে একটা তো এখনও বেশ দাপটের সঙ্গে টিকে আছে। ব্যান্ডেল চার্চ। হুগলি নামটাও পর্তুগিজদের দেওয়া। হুগলি শব্দটা এসেছে পর্তুগিজ উগোলিম্‌ থেকে।"

"অ্যাই, জ্ঞান মেরো না তো। তার চেয়ে বরং একটা কাজের কাজ করো। চলো, আমরা নেক্সট উইকে একটা সুন্দরবন ট্রিপ মেরে আসি।"

"গ্র্যান্ড আইডিয়া!" টুপুর লাফিয়ে উঠল, "আমরা কি গোটা টুরটাই লঞ্চে ঘুরব?"

"অবশ্যই। সজনেখালিতে রাত্রিবাস, আর দিনভর লঞ্চে টো টো। সুধন্যখালি, বড় চামটা, ছোট চামটা, ভাগবতপুরের কুমির প্রকল্প,

নেতি ধোপানির ঘাট....। একটা নাইট পাখিরালয়ের টুরিস্ট লজেও থাকতে পারি।"

"সুধন্যখালিতে মঙ্গল থাকে না? নীলাম্বর দাদার মেসো?"

"গুড মেমরি।" পার্থ মাথা দোলাল, "সুন্দরবনে মানুষ আর জীবজন্তু প্রায় পাশাপাশি বাস করে। যেতে যেতে দেখবি নদীর পারে কুমির রোদ পোয়াচ্ছে, তার খানিক তফাতেই হয়তো লোকে চিংড়িমাছের মীন, মানে বাচ্চা ধরছে।"

"কপালে থাকলে বাঘও চোখে পড়তে পারে।"

"সুন্দরবনে বাঘ দেখলে নাকি ফিরে এসে গল্প করার আর চান্স পাওয়া যায় না।" পার্থ হ্যা হ্যা হাসল, "সুন্দরবনের আসল অ্যাট্রাকশন কিন্তু বাঘ নয় রে টুপুর। ওই জঙ্গলটাই মেন দ্রষ্টব্য। অমন বেঁটেবেঁটে গাছে ভরা ফরেস্ট খুব কম দেখতে পাবি। গাছগুলোর অ্যাভারেজ হাইট দশ-বারো ফিটের বেশি নয়। ম্যানগ্রোভ ট্রি। জল থেকে উঠে এসেছে ডাঙায়। সুন্দরী, হেঁতাল, গরান...। সুন্দরী গাছের আড়ালে বাঘ লুকিয়ে থাকে। আর হেঁতালের ডাল হাতে থাকলে সাপ নাকি কাছে ঘেঁসে না।"

"সুন্দরী গাছের থেকেই জঙ্গলটার নাম সুন্দরবন হয়েছে, না?"

"এ নিয়ে আরও কিছু মত আছে।" পার্থ বিজ্ঞের মতো বলল, "তোকে তো বলেইছিলাম, সুন্দরবনের মেন পার্ট পড়ে বাংলাদেশে। ওখানে সুন্দরবন হল বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে। ওই বাখরগঞ্জ জেলায় এক নদী আছে, নাম সুঞ্জা। নদীটার নাম থেকেই নাকি..."

"তুমিও তো দেখছি দিব্যি জ্ঞানভাণ্ডার খুলে বসলে!"

"এ তো শুধুই উপক্রমণিকা। ভূরিভোজের আগে শাকপাতা। এরপর তো আস্তে আস্তে মেন কোর্সে ঢুকব। সুন্দরবনের ভূগোল-ইতিহাস, সেখানকার জীবজন্তুদের স্বভাব..."

"থামো। কাল তো ফিরেই ভোঁসভোঁস নাক ডাকালে, কোনও

কথাই হল না," মিতিন গুছিয়ে বসল, "আগে বলো, কাল বিজ্ঞানীর বাড়ি কেমন দেখলে?"

"দারুণ। চমৎকার মডার্ন ল্যাবরেটরি। কোথাও এতটুকু অগোছালো ভাব নেই। চোখ বোলালেই বোঝা যায় ডক্টর সান্যালের কাজকর্ম খুব সিস্টেমেটিক।"

টুপুর ফোড়ন কাটল, "স্নেকরুমটার কথাও বলো।"

"অবশ্যই। এরকম একখানা সাপের আড্ডা বানানো কি মুখের কথা! ভদ্রলোক অনেক প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে গবেষণায় নেমেছেন। পাছে লোডশেডিংয়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটে তার জন্য সোলার এনার্জির বন্দোবস্তও করা আছে।"

"উম। আর মানুষটাকে লাগল কেমন?"

"কাজপাগল। খুবই ডেডিকেটেড। যাকে বলে বিজ্ঞানে নিবেদিতপ্রাণ। দেশকে সত্যি সত্যিই খুব ভালবাসেন। নইলে কেউ বউ-মেয়ে ফেলে আমেরিকা থেকে এসে ওরকম একটা অগা জায়গায় বছরের পর বছর রিসার্চে ডুবে থাকতে পারেন?"

"যাই বলো পার্থমেসো, ডক্টর সান্যাল একটু খ্যাপাও আছেন। না হলে কাউকে কিছু না বলে ওরকম হুট করে কেউ ঘাটশিলা চলে যায়?"

"প্রকৃত বিজ্ঞানীরা ওরকমই হয় রে টুপুর। নিল্‌স বোরের নাম শুনেছিস? আধুনিক বিজ্ঞানের একটা পিলার। জটিল কোনও সমস্যা মাথায় এলে তিনি রাতদুপুরে আর-এক বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের বাড়িতে হানা দিতেন। তারপর সারারাত ধরে অঙ্ক নিয়ে কুস্তি চলত দু'জনে। ঘর-সংসার, ইহজগৎ সব তখন তাঁদের মাথা থেকে উধাও। পরমাণু বোমা তৈরির সময়..."

"ফের গপ্পো জুড়লে?" মিতিন থামাল পার্থকে, "আমরা সুমন্ত্র সান্যালকে নিয়ে কথা বলছি। নিল্‌স বোরকে নিয়ে নয়।"

"তো?"

"সুমন্ত্র সান্যালের চ্যালাটিকে কেমন লাগল? শ্রীমান নীলাম্বর?"

"ভক্ত হনুমান। স্যারের অত্যন্ত অনুগত। এবং ডক্টর সান্যালের সান্নিধ্যে এসে বেশ কেতাদুরস্ত বনে গিয়েছে। চুলের কায়দাটা দেখেছিলে?"

"বিশ্বাসী বলেই তো মনে হয়। তাই না?"

"কথাবার্তা শুনে তো সেরকমই লাগল। তবে বাড়ির পুরো কন্ট্রোলটাই তো ওর হাতে, স্যারের পয়সাকড়ি সরায় কিনা বলতে পারব না।"

আলোচনায় ছেদ পড়ল। টেলিফোন ঝংকার তুলেছে। ভুরু কুঁচকে উঠে গেল মিতিন। টেবিলে ফিরল মিনিটপাঁচেক পর। ঈষৎ আনমনা হয়ে।

পার্থ কৌতূহলী মুখে জিজ্ঞেস করল, "কার ফোন ছিল?"

ভারতী কফি রেখে গিয়েছে টেবিলে। আলগা চুমুক দিয়ে মিতিন বলল, "অনিশ্চয়বাবু।"

"কী সমাচার?"

"আবার বাসন্তীতে অশান্তি।"

"তাই নাকি? কী হল?"

"কাল রাতে ডক্টর সান্যালের বাড়িতে চোর এসেছিল। আজ সকালে নীলাম্বর গিয়ে পুলিশে রিপোর্ট করেছে। বাসন্তী থানা দুপুরেই আই জি সাহেবকে জানিয়েছিল। উনি আমায় এখন নিউজটা কমিউনিকেট করলেন।"

"ও। কী চুরি গেছে?"

"যায়নি কিছু। চোরের পায়ের আওয়াজ পেয়েই নীলাম্বরের নাকি ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে 'কে-কে' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই চোর ভাগলবা।

"তেমন সিরিয়াস কিছু নয় তা হলে?"

"অনিশ্চয়বাবুরও সেই রকমই মত। তবে উনি কোনও চান্সে যেতে চান না। কাল থেকে পুলিশ গার্ডের বন্দোবস্ত করতে বলেছেন থানাকে। অন্তত রাতে যেন ডক্টর সান্যালের বাড়ির নিরাপত্তা কোনওভাবে না বিঘ্নিত হয়।"

"ঠিকই করেছেন। ভি আই পি-টি আই পি'র বাড়িতে একটু পাহারা থাকা ভাল। কোত্থেকে কী ঘটবে, মন্ত্রীমশাই আবার অনিশ্চয়বাবুর প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবেন।"

"হুম!"

বলেই মিতিন পুরোপুরি চুপ। নিঃশব্দে কফি শেষ করে চলে গেল ব্যালকনিতে। ঘুরে এসে অদূরে সোফায় বসেছে। দু'মিনিটও সুস্থির থাকল না, উঠে টিভি চালিয়ে একের পর এক চ্যানেল ঘোরাচ্ছে রিমোটে। ঝুপ করে টিভি অফ করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। বুমবুম কী একটা বলতে যাচ্ছিল, 'আহ' বলে তাকে থামিয়ে ফের গিয়েছে ব্যালকনিতে।

টুপুরের কেমন যেন লাগছিল। সামান্য একটা খবরে এত চিত্তচাঞ্চল্য কেন জাগল মিতিনমাসির?

পায়ে পায়ে টুপুর ব্যালকনিতে এল। মিতিনমাসি চিন্তায় ডুবে থাকলে ডাকতে সাহস হয় না, কোনওক্রমে গলা ঝেড়ে বলল, "কী হল গো মিতিনমাসি? এত কী ভাবছ?"

দূরমনস্কভাবে মিতিন বলল, "কয়েকটা ঘটনাকে সুতো দিয়ে গাঁথার চেষ্টা করছি।"

"কীরকম?"

"একটা জলজ্যান্ত ডোবারম্যান ভ্যানিশ হয়ে গেল। তারপর ডক্টর সান্যাল কয়েকদিনের জন্য মিস্টিরিয়াসলি বেপাত্তা হয়ে গেলেন। তিনি ফিরে আসার পরদিনই চোর এল রাত্তিরে। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে

কোনও সম্পর্ক নেই তো? আমরা ধরেই নিতে পারি, ডোবারম্যানটাকে কেউ না-কেউ মেরে ফেলেছে এবং সরিয়েও দিয়েছে। অর্থাৎ যে বা যারা মেরেছে, তারা চায়নি কুকুরের ডেডবডিটা প্রকাশ্যে পড়ে থাকুক। আর তা নিয়ে একটা ব্যাপক শোরগোল উঠুক। কিন্তু কে সে? নিশ্চয়ই কোনও সাধারণ ছিঁচকে চোর নয়? সে কী চায়?"

টুপুর ধন্দমাখা মুখে বলল, "কী চাইতে পারে?"

"এমন নয় তো, ডক্টর সান্যাল অলরেডি ক্যান্সারের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে ফেলেছেন? বিশেষ কোনও কারণে আপাতত খবরটা গোপন রাখতে চান? যদি সত্যিই ফর্মুলা আবিষ্কার হয়ে গিয়ে থাকে, তার মূল্য কিন্তু কম নয়। লাখ ছাপিয়ে দাম কোটি টাকাতেও পৌঁছোতে পারে," মিতিন দু'-এক সেকেন্ড নীরব থেকে হঠাৎই বিড়বিড় করে উঠল, "তা হলে কি আর কেউ আবিষ্কারের খবর জেনে ফেলেছে। নীলাম্বর বলছিল তিনটে লোক ডক্টর সান্যালের কাছে এসেছিল। তাদের সঙ্গে ডক্টর সান্যালের ঝগড়াঝাটি হয়। লোক তিনটে কে? তারাই কি কালপ্রিট? লোকগুলো কি লোভ বা ভয় দেখিয়ে ডক্টর সান্যালের কাছ থেকে ফর্মুলা আদায় করতে এসেছিল? সেদিন সুবিধে করতে না পেরে তারপর থেকে কোনও একটা ডেফিনিট ছক কষে এগোচ্ছে তারা? রজারের ইনসিডেন্টটা তাদের ফার্স্ট স্টেপ?"

"তার মানে তারাই রজারকে মেরেছে?"

"অসম্ভব নয়। তারা জানে ফর্মুলা হাতানোর জন্য বাড়িতে লুকিয়েচুরিয়ে ঢুকতে গেলে রজারই প্রথম বাধা। সুতরাং নিঃসাড়ে রজারকে হঠিয়ে দেওয়াই শ্রেয়। এবং এভাবে ডক্টর সান্যালকে একটা মোক্ষম শাসানিও দেওয়া গেল।"

"কিন্তু আবিষ্কারের কথা বাইরের লোক জানবে কী করে?"

"ঘরের লোক জানালেই জানতে পারে।"

"মানে... তুমি বলছ... নীলাম্বর...!" টুপুর থতমত খেয়ে গেল, "কী করে হয় মিতিনমাসি?"

"সবই হতে পারে রে টুপুর। লোভ বড় সাংঘাতিক জিনিস। লোভের ফাঁদে পা পড়লে মানুষের হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায়। ভুলে যাস না, নীলাম্বর গরিব ঘরের ছেলে। মোটা টাকার টোপ দিলে তার মাথা বিগড়ে যেতেই পারে।"

"তবু... তবু...," টুপুর তাও মানতে পারছিল না, "নীলাম্বর যদি দলে থাকে, তা হলে রজারকে মারার দরকার কী? নীলাম্বর নিজেই তো ফর্মুলাটা পাচার করতে পারে।"

"নীলাম্বর হয়তো শুধু আবিষ্কারের খবরটুকুই জানে। কিন্তু ফর্মুলাটার হদিশ তার কাছে নেই! কিংবা হয়তো প্রতিষেধক বানানোর প্রসেসটা এমনভাবে কম্পিউটারে ফিড করা আছে, যা উদ্ধার করার বিদ্যে নেই নীলাম্বরের। এবং তার জন্য দরকার অন্য কোনও পাকা মাথা। সেই ধরনের কাউকে বাড়িতে এন্ট্রি দিতেই...," বলেই মিতিন ঘাড় নাড়ছে দু'দিকে, "উঁহু, এ যুক্তিও ধোপে টেকে না। ডক্টর সান্যাল তো মাঝে ক'দিন ছিলেন না, ওই সময়ই তো সব তোলপাড় করে খোঁজাখুঁজির কাজটা সারা যেত। তা ছাড়া সে নিজে গিয়ে থানায় মিসিং ডায়েরি লিখিয়েছে। আপত্তিকর তিনটে লোক এসেছিল সে গল্পও যেচে করল আমাদের কাছে...। তারপর ধর, আবিষ্কার যদি হয়ে গিয়েই থাকে, ডক্টর সান্যাল কি সেটা বাড়িতে রেখে বেমালুম চলে যাবেন? তাও আবার এমন এক সময়ে, যখন তিনি রজারকে হারিয়ে যথেষ্ট ইনসিকিয়োর ফিল করছেন! তা হলে কি তিনি ফর্মুলাটা সঙ্গে নিয়েই সেমিনারে গিয়েছিলেন? সেখান থেকে ঘাটশিলা? ...উঁহু, এ থিয়োরিটাও যেন কেমন কেমন লাগছে!"

"তা হলে?"

"কোথাও একটা জট পাকিয়ে আছে, বুঝলি।" মিতিন মাথা ঝাঁকাল, "নাঃ, কাল একবার বাসন্তী ঘুরেই আসি। ডক্টর সান্যাল সত্যিই যদি বিপদে পড়ে থাকেন, তাঁর পাশে তো দাঁড়ানো উচিত।"

"ঠিকই তো। চলো, আমিও যাব সঙ্গে।"

"চল, কাল ভোরভোরই বেরিয়ে পড়ি। এবার আর বাসরুট নয়। ভেঙে ভেঙে যাব। ট্রেন ধরে প্রথমে ক্যানিং। সেখান থেকে ভুটভুটিতে ডকের খেয়া। তারপর অটো ধরে সোনাখালি। শেষে পুরন্দর পার হয়ে বাসন্তী। সময়ও কম লাগবে, জার্নিও একটু অন্য রকম হবে।"

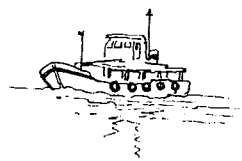

টুপুর আর মিতিন বাসন্তী পৌঁছোল সকাল ন'টা নাগাদ। পথে অনেকবার যান বদল করতে হলেও কষ্ট হয়নি বিশেষ। কাল ঝড়-বৃষ্টি হয়ে সকালটাও আজ বেশ মনোরম। ফুরফুরে হাওয়া বইছে, যেন বসন্তকাল।

ঘাটে নেমে টাটকা মেজাজে সুমন্ত্র সান্যালের বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল মাসি-বোনঝি, কাছাকাছি এসে হঠাৎই হকচকিয়ে গেছে দু'জনে। গেটের সামনে অত ভিড় কেন? কীসের এত গুলতানি হচ্ছে? কী ঘটল রে বাবা?

জটলার সামনে আসতেই দু'-চারটে বাক্য উড়ে এল টুপুরের কানে।

"আহা, বেঘোরে মারা গেল রে বেচারা!"

"একেই বলে মা মনসার লীলা, বুঝলে! দিনরাত যে সাপের সেবা করে, তাকেই কিনা সাপের ছোবল খেতে হল!"

"বড় ভাল ছিল গো ছেলেটা! কী মিষ্টি ব্যবহার, সদাসর্বদা হাসিমুখ...!"

"নিয়তির লিখন হে, নিয়তির লিখন! কার কপালে কীভাবে যে মৃত্যু থাকে!"

টুপুর আর মিতিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। টুপুর অস্ফুটে বলল, "কাকে সাপে কেটেছে? নীলাম্বরদাদাকে?"

মিতিন নিচু গলায় বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

স্থানীয় মানুষদের কিছু জিজ্ঞেস করল না মিতিন। ভিড় পেরিয়ে, গেট টপকে ঢুকে পড়ল কম্পাউন্ডের ভিতরে। তখনই চোখে পড়ল নীলাম্বরের কাদামাখা দেহটাকে। আমগাছের তলায় শোয়ানো। পরনে হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি। চার-পাঁচটা অল্পবয়সি ছেলে বসে আছে মৃতদেহের পাশে।

টুপুরের বিশ্বাস হচ্ছিল না। আটচল্লিশ ঘণ্টাও হয়নি যার সঙ্গে অত গল্প করে গেল, কালও যার খবর পেয়েছে, আজ আর সে নেই? এই লোকটাকে নিয়েই না কাল রাতে তারা কত জল্পনাকল্পনা করেছে!

ঘোর-লাগা পায়ে মিতিনের সঙ্গে আমগাছের কাছে এগোচ্ছিল টুপুর। একটা কুড়ি-একুশ বছরের ছেলে নীলাম্বরের পাশ থেকে উঠে এল আচমকা। থমথমে গলায় মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, "দিদি, আপনারা তো পরশুই এসেছিলেন, তাই না?"

"হুঁ।" মিতিন আপাদমস্তক জরিপ করল ছেলেটাকে। ভারী গলায় বলল, "কেন বলুন তো?"

"না... আপনাদের সেদিন দেখেছিলাম... সঙ্গে আরও দু'জন ছিলেন..."

"আপনার পরিচয় কিন্তু এখনও পাইনি।"

"আমি রতন। রতন হেনরি মণ্ডল। এই তো, সামনেই চার্চে কাজ করি। নীলাম্বরদা আমাদের চার্চে খুব যেত। ফাদার, ব্রাদার সকলের সঙ্গেই পরিচয় ছিল নীলাম্বরদার। আমরা প্রত্যেকেই এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি।"

"ও।" মিতিন স্থির চোখে তাকাল, "তা দুর্ঘটনাটা ঘটল কখন?"

"মনে হয় শেষ রাতে। কিংবা কাকভোরে।" রতনের স্বর ধরাধরা, "চার্চের পিছনভাগে গাঙের পারে পড়ে ছিল দেহটা। প্রথম দেখতে পান ফাদার ম্যাথু। তখন সাড়ে পাঁচটা-পৌনে ছ'টা হবে। রোজকার মতো মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলেন, তখনই...। ঘাবড়ে গিয়ে ফাদার চেঁচামিচি শুরু করে দেন। আমরাও পড়িমরি করে গিয়ে দেখি, উপুড় হয়ে পড়ে আছে নীলাম্বরদা।"

"তখনও কি প্রাণ ছিল?"

"না দিদি। শরীর তখনই বরফের মতো ঠান্ডা। মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে।"

"তা সাপে কেটেছে বুঝলেন কী করে?"

"ডান গোড়ালিতে দাঁতের দাগ আছে দিদি। নীলাম্বরদার স্যার তো দেখে বললেন চন্দ্রবোড়া।"

"পুলিশে খবর দিয়েছিলেন?"

"ফাদার তো তখনই চার্চ থেকে ফোন করলেন থানায়। আর আমি ছুটে এলাম এ-বাড়ির স্যারকে খবর দিতে। উনি তখন ঘুমোচ্ছেন। খবরটা শুনে উনি প্রথমটা তো একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আমিই স্যারকে প্রায় ধরেধরে গাঙপারে নিয়ে গেলাম। বড্ড ভেঙে পড়েছেন স্যার। কান্নাকাটি করছেন।"

কথার মাঝেই নীলাম্বরের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেছে মিতিন।

পরখ করছে পায়ের ক্ষতটাকে। দেখতে দেখতেই জিজ্ঞেস করল, "এখানে বডি আনল কে? পুলিশ?"

"সঙ্গে পুলিশের লোক ছিল। তবে আমরাই ধরাধরি করে..."

"ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে?"

"চেম্বার খুললে ডাক্তারবাবু গিয়ে নিয়ে আসতে বলেছেন।"

"কোন ডাক্তার? কোথায় চেম্বার?"

"সামন্ত ডাক্তার। ফেরিঘাটের কাছেই বসেন। বাজারটায়।"

"নীলাম্বরের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে?"

"পুলিশ মেসেজ পাঠিয়েছে। স্যারও বোধহয় ফোন করেছেন ন্যাজাটে। নীলাম্বরদার বাপ-দাদা এসে দেহ দাহ করবে। নীলাম্বরদার এক মেসো আছে সুধন্যখালিতে, তার কাছেও লোক চলে গিয়েছে।" রতন নাক টানল, "কী একটা বাজে ব্যাপার হয়ে গেল বলুন তো দিদি! নীলাম্বরদার রোজগারপাতির উপরে বাড়ির লোকরা অনেকটা ভরসা করে থাকত, ওরাও কী বিপদে পড়ে গেল ভাবুন।"

মিতিন উঠে পড়ল। শুকনো গলায় বলল, "সে আর কী করা যাবে! দুর্ঘটনার ওপর তো কারও হাত নেই।"

রতন নিচু স্বরে বলল, "একটা কথা বলব দিদি?"

"কী?"

"স্যারের সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই খুব চেনাজানা। স্যারকে একটু বলবেন, নীলাম্বরদার ফ্যামিলির কথাটাও তিনি যদি একটু ভাবেন..."

"বলব।"

আর কথা না বাড়িয়ে টুপুরকে নিয়ে মোরাম বিছানো পথ পার হল মিতিন। বারান্দায় উঠে খানিক ইতস্তত করে ঢুকে পড়েছে অন্দরে।

সুমন্ত্র সান্যাল বাইরের ঘরেই ছিলেন। সোফায়। পায়ের আওয়াজ

পেয়ে চোখ থেকে হাত সরিয়েছেন। ভীষণ অবাক হয়ে বললেন, "একী? আপনারা? কী করে খবর পেলেন?"

মিতিন ঠান্ডা গলায় বলল, "হঠাৎই কিছু কৌতূহল নিরসনের জন্য আপনার কাছে এসেছিলাম। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখি এইসব কাণ্ড ঘটে বসে আছে।"

বিস্ময়টাকে যেন খানিকটা সামলে নিলেন সুমন্ত্র। কষ্টের গলায় বললেন, "তাই বলুন। আমি তো ভাবছিলাম এ দেশের পুলিশ ডিটেকটিভ এত প্রম্প্ট হল কবে থেকে, যে মানুষ মরতে না-মরতে কলকাতা থেকে বাসন্তী পৌঁছে গেল! ...বসুন।"

সোফায় বসে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মিতিন। তারপর মৃদু গলায় বলল, "শুনলাম আপনি খুব ভেঙে পড়েছেন..."

"হুঁ।" সুমন্ত্র একটা শ্বাস ফেললেন, "ছেলেটা আমার বড় আপন হয়ে গিয়েছিল। ওকে আমি নিজের ভাইয়ের মতো দেখতাম।"

"বুঝতে পারছি।" মিতিন সামান্য ঝুঁকল, "আমি কি আপনাকে একটা-দুটো প্রশ্ন করতে পারি? অ্যাবাউট দিস মিসহ্যাপ?"

"করুন।"

"নীলাম্বর ভোরবেলা হঠাৎ পুরন্দরের ধারে গেল কেন?"

"কী জানি, আমিও তো ভেবে পাচ্ছি না। আমি বরাবরই লেট রাইজার। অনেক রাত অবধি জাগি তো, সাড়ে সাতটা-আটটার আগে ঘুমই ভাঙে না," সুমন্ত্র গলা ঝাড়লেন, "তবে নীলাম্বর খুব সকাল সকালই উঠত। ঘরের টুকটাক কাজকর্ম সারত, বাগানের দেখভাল করত... কে জানে, হয়তো রাস্তাঘাটে একটু হেঁটেও আসত। কিংবা হয়তো আজই বেরিয়েছিল নিয়তির টানে।"

"হুঁ, বড় প্যাথেটিক ডেথ।"

"আমার মনটাও রিয়্যালি ডিস্টার্বড হয়ে গিয়েছে ম্যাডাম। ভাবছি এখানে আর কাজকর্ম করব না। ওই যে অ্যাস্ট্রোলজির ভাষায় কী

যেন বলে... এখানে শনির দশা লেগেছে। একের পর এক মিসহ্যাপ। প্রথমে আমার কুকুরটা গেল, তারপর কোথা থেকে কিছু নেই হঠাৎ চোরের উৎপাত, আর লাস্টলি এই নীলাম্বর। দিস ইজ় টু মাচ। বেটার আই শুড গো ব্যাক টু মিশিগান এগেন। দেশের মাটিতে বসে দেশের জন্য কাজ করা আমার কপালে নেই। মিশিগানেই আমি প্রোজেক্ট কমপ্লিট করব। বউ-মেয়েও খুশি হবে, আমারও শান্তি।"

"একটু অনধিকারচর্চা করব স্যার?"

"বলুন?"

"আপনার কাজটা এখন ঠিক কোন পর্যায়ে আছে?"

সুমন্ত্র সোজা হয়ে বসলেন। সামান্য বিরক্ত স্বরেই বললেন, "কেন বলুন তো?"

"না মানে... আপনি যদি প্রোজেক্টের প্রায় লাস্ট স্টেজে চলে গিয়ে থাকেন, তা হলে আপনাকে হারানো কি আমাদের একটা জাতীয় ক্ষতি নয়? আজ থেকেই তো আই জি সাহেব সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট জোগাড় করে আপনি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করুন না।"

"না ম্যাডাম, এখানে আর নয়। অ্যাট লিস্ট এইরকম রিমোট জায়গাতে তো নয়ই। কাজ এখনও প্রচুর বাকি। দেশেই যদি রয়ে যাই, তবে বাঙ্গালোর টাঙ্গালোর কোথাও চলে যাব।"

"স্টিল... একটু ভাবুন।"

সুমন্ত্র উত্তর দিলেন না। বসে আছেন গুম হয়ে। হঠাৎই বলে উঠলেন, "আপনি যেন কী সব কৌতূহল নিরসনের কথা বলছিলেন?"

"হ্যাঁ...। পরশু রাতে চোর আসা সম্পর্কে একটু বিশদ জানার ইচ্ছে ছিল।"

"কেন?" এতক্ষণে সুমন্ত্রর ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি, "আপনি চোর ধরবেন?"

"উঁহু। আমি চোরের মোটিভটা বুঝতে চাই।"

"মানে?"

"আপনার বাড়িতে তো স্যার সোনাদানা, মণিমুক্তো তেমন নেই, তবু চোর এল কেন?"

"শুধু মণিমুক্তোর আশাতেই কি চোর আসে? এখানকার গরিব লোকরা বাসনকোসন-কাপড়চোপড় পেলে বর্তে যায়। কুকুরের ভয়ে এতদিন সাহস পায়নি, এবার তাদের বুকের পাটা বেড়েছে।"

"তাই হবে হয়তো। তবু আপনার মতো এক নামী মানুষের বাড়িতে ছিঁচকেবৃত্তি...! চোরটা স্যার কত রাতে এসেছিল?"

"চোর ভেগে যাওয়ার পর ফের শোওয়ার সময় ঘড়ি দেখেছিলাম। দুটো কুড়ি।"

"আপনি তো আগে টের পাননি?"

"না। আমি সবে আধঘণ্টাটাক আগে কম্পিউটার অফ করে এসে শুয়েছিলাম। ভালই ঘুম এসে গিয়েছিল। নীলাম্বরের হাউমাউ শুনে চমকে জেগে উঠি। ব্যাটা আমার দরজার সামনে দিয়েই গেল বটে, তবে ধরতে পারলাম না।"

"মানে, আপনি তাকে দেখেছিলেন?"

"একঝলক। বেঁটেখাটো চেহারা। গাট্টাগোট্টা। তাড়াও করেছিলাম ব্যাটাকে। নীলাম্বরের সঙ্গে। কিন্তু সে ওস্তাদ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ফাস্ট। উঠোনের দরজাটা তো খোলাই থাকে, ওই পথেই বেরিয়ে খরগোশ-পায়ে পাঁচিল টপকে পগারপার," গুছিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎই থমকেছেন সুমন্ত্র, "এবার আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি ম্যাডাম?"

"অবশ্যই।"

"সামান্য একটা লোকাল চোর নিয়ে আপনি এত ভাবিত হয়ে পড়েছেন কেন? আই জি সাহেব কি ব্যাপারটা আলাদা করে ইনভেস্টিগেট করতে পাঠিয়েছেন?"

"না, না, আমি অন মাই ওন এসেছি। নীলাম্বরের মুখে শুনেছিলাম আপনার কাছে মাসদুয়েক আগে নাকি তিনটে লোক এসেছিল। তাদের সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য মতোও হয়। তারপরই আপনার রজার হারাল, বাড়িতে চুরির অ্যাটেম্প্ট... এগুলোকে একটু লিংক করার চেষ্টা করছিলাম আর কী। কেন যেন মনে হচ্ছিল, এর থেকে আপনার কোনও বিপদ ঘটতে পারে।"

সুমন্ত্রর শুকনো মুখে এতক্ষণে একটা স্পষ্ট হাসি ফুটেছে। মিলিয়েও গেল হাসিটা। ভুরুতে আলগা ভাঁজ ফেলে বললেন, "আপনারা গোয়েন্দারা পারেন বটে! তিলকে তাল বানিয়ে ফেলেছেন। নীলাম্বর যাদের কথা বলেছিল, যত দূর মনে পড়ছে, তারা ছিল গভর্নমেন্টের লোক। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি মন্ত্রকের তিনটে বোকা আমলা। আমার রিসার্চ নিয়ে কিছু সিলি কমেন্ট করেছিল। আমিও ওদের একটু বকাঝকা করেছিলাম। ওই তুচ্ছ ঘটনাকে জটিল করার মনে হয় কোনও প্রয়োজন নেই।"

"হুম।" মিতিন মাথা দোলাল, "আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। এই অসময়ে অহেতুক আপনাকে খানিক জ্বালাতন করলাম।"

"না না, ঠিক আছে।" সুমন্ত্র নড়েচড়ে বসলেন, "সরি, আপনারা এত দূর থেকে এলেন, আজ কিন্তু কোনও খাতিরযত্ন করতে পারলাম না। জলটল খাবেন?"

"নো থ্যাঙ্কস। ব্যস্ত হবেন না," মিতিন ঘড়ি দেখল, "নীলাম্বরের বাড়ির লোকজন কখন আসছে?"

"কী করে বলি। খবর তো গিয়েছে অনেকক্ষণ। তবে মনে হয় না দুপুরের আগে তারা পৌঁছোতে পারবে," বলতে বলতে আচমকাই

ঘাড় নুইয়েছেন সুমন্ত্র। চশমা খুলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "কী যে হয়ে গেল! আমার আর ভাল লাগছে না। কিছু ভাল লাগছে না।"

টুপুরও ফোঁস করে শ্বাস ফেলল, "সত্যি, কী বিশ্রী ব্যাপার! শেষে কিনা চন্দ্রবোড়ার কামড়ে মরতে হল নীলাম্বরদাদাকে!"

সুমন্ত্রর ঘাড় আরও ঝুঁকে গেল।

মিতিন গলা নামিয়ে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা স্যার, সাপটা যে চন্দ্রবোড়াই ছিল, এটা বোঝা গেল কী করে?"

"প্লেন অ্যান্ড সিম্পল।" সুমন্ত্র চোখ তুললেন, "যতটা জায়গা জুড়ে সোয়েলিং হয়েছে, তাতে ধরাই যায় সাপ অনেকটাই বিষ ঢেলেছে। কেউটে বা কালাচ একবারে যে পরিমাণ বিষ ঢালতে পারে, তার চেয়ে ঢের বেশি। প্লাস, নাক-চোখ-মুখ দিয়ে রক্তও বেরিয়েছে। যা একমাত্র চন্দ্রবোড়ার বিষ শরীরে গেলেই হয়।"

"চন্দ্রবোড়ার বিষে মানুষ কতক্ষণ পরে মারা যায়?"

"এক-দেড় ঘণ্টা সময় তো লাগেই।"

"তার মানে ছোবল খাওয়ার পর নীলাম্বরও ঘণ্টাদেড়েক বেঁচে ছিল?"

"থাকার তো কথা। আমার তো সেটাই অবাক লাগছে। নীলাম্বর ছোবল খেয়েই বাড়িতে দৌড়ে এল না কেন! আমার ল্যাবরেটরিতে তো অ্যান্টি-ভেনম মজুতই থাকে। ইঞ্জেকশনটা পড়লে বেঁচে যেত," সুমন্ত্র একটুক্ষণ থেমে থেকে ফের বললেন, "আসলে কী হয় জানেন? বিষধর সাপে কাটলে বহু মানুষই নার্ভাস হয়ে সেন্স হারিয়ে ফেলে। নীলাম্বরও বোধহয়... যদিও আমি ওকে সাহসী বলেই ভাবতাম।"

বাইরে হঠাৎ একটা ডুকরে ওঠা কান্নার আওয়াজ। তাড়াতাড়ি বাইরে এল টুপুর আর মিতিন। পিছন পিছন সুমন্ত্রও। বারান্দা থেকেই দেখতে পেল বছরপঞ্চাশের ধুতিশার্ট পরা এক গ্রাম্য মানুষ নীলাম্বরের বুকে হাত রেখে গলা ছেড়ে কাঁদছে।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "উনি কে? নীলাম্বরের বাবা?"

সুমন্ত্র কোনও জবাব না দিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে নেমে গেলেন লোকটার কাছে। তাঁকে দেখেই লোকটার কান্না আরও বেড়ে গেল, "এ কী সব্বোনাশ হল বাবু! আমি এখন নীলুর বাবাকে মুখ দেখাব কী করে! কী কুক্ষণে ওকে আমি কাজে দিয়েছিলাম!"

সুমন্ত্র হাত রাখলেন লোকটার কাঁধে। শান্ত হতে বলছেন।

টুপুর ফিসফিস করে বলল, "ওই লোকটাই বোধহয় মঙ্গল।"

মিতিন বলল, "হুঁ।"

"ডেকে কথা বলবে?"

"না থাক। চল, আমরা এগোই।"

ধীর পায়ে গেট অবধি গিয়েও মিতিন দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ কুঁচকে কী যেন ভাবছে। হাতের ইশারায় ডাকল রতনকে।

দৌড়ে এসেছে রতন, "কিছু বলছেন দিদি?"

"নীলাম্বরের বডিটা কোথায় পড়ে ছিল আমায় একবার দেখাবেন?"

"যাবেন? চলুন।"

গেট পেরিয়ে বিশ-পঁচিশ পা গেলে ডাইনে এক সরু মেঠো পথ। দু'ধারে ইতস্তত খেজুর, বাবলা আর কাঁটাগাছের ঝোপ। মাঝেমাঝে ছোট-বড় বাঁশঝাড়। শুরুতেই দু'-চারটে মাটির বাড়ি পড়ল। তারপর আর বিশেষ বসতি নেই। কাল রাতের বৃষ্টিতে রাস্তার দশাও ভারী বেহাল। এঁটেল মাটি গলে কাদাকাদা হয়ে আছে। কাদায় অজস্র পায়ের ছাপ। সকালে নির্ঘাত এই পথে অনেক মানুষ নীলাম্বরকে দেখতে আসা-যাওয়া করেছে।"

সাবধানে পা টিপে-টিপে হাঁটছিল টুপুর। মিতিনও। একখানা গর্ত লাফ দিয়ে টপকে মিতিন বলল, "এ রাস্তা দিয়ে পুরন্দর পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগে?"

"মিনিটপাঁচেক। রাস্তাটা গাঙের ধারে গিয়ে বাঁ দিক পানে ঘুরে গিয়েছে। শেষ হয়েছে আমাদের গির্জার পিছনটায়।"

"জায়গাটা এত ফাঁকা কেন?"

"সবই গির্জার জমি দিদি। এমনিই পড়ে আছে।"

পাঁচ নয়, ধীরেসুস্থে চলতে গিয়ে প্রায় দশ মিনিট লেগে গেল। রতন যেখানে এসে থামল, তারপর আর এগোনোর জো নেই। সামনে থকথকে কাদা। হাতপনেরো দূরে পাড় ঢাল হয়ে নেমে গিয়েছে পুরন্দরে।

রতন বলল, "ওই কাদার মুখটাতেই পড়ে ছিল নীলাম্বরদা।"

উবু হয়ে বসে জায়গাটা দেখছিল মিতিন। ঘুরে ঘুরে সন্ধানী চোখে তাকাচ্ছিল চারদিকে। রতনকে জিজ্ঞেস করল, "নীলাম্বর শুধু হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরেই বেরিয়ে পড়েছিল?"

"তাই তো দেখলাম দিদি।"

"ঘড়ি ছিল হাতে?"

"নাহ।"

"পকেটে টাকাপয়সা?"

"উঁহু।"

"কোনও কাগজপত্র? বা দেশলাই ফেসলাই? বা আর কিছু?"

"না দিদি, কিছুই ছিল না পকেটে। পুলিশ এসে আমাদের সামনেই তো হাতড়ে হাতড়ে দেখল। দুটো পকেটই বিলকুল ফরসা।"

"আপনি শিয়োর?"

"একশো ভাগ। স্বচক্ষে দেখেছি।"

মিতিন আর কিছু বলল না। বেজায় গম্ভীর সহসা। পুরন্দরের পারে আর দাঁড়ালও না। মুখে কুলুপ এঁটে ফিরল মেটে পথটুকু। সুমন্ত্র সান্যালের বাড়ির সামনে এসে ছেড়ে দিল রতনকে। ছেলেটা ভিতরে ঢুকে যাওয়ার পর টুপুরকে বলল, "চল, একবার থানায় যাই।"

"থানা? কেন?"

"ও সি-কে বলতে হবে নীলাম্বরকে এখন দাহ করা যাবে না। বডি পোস্টমর্টেমে পাঠানো দরকার।"

"সে কী? সাপে কাটলে পোস্টমর্টেম হয়?"

"সত্যি-সত্যি সাপের কামড়ে মরলে প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নীলাম্বরকে সাপে কাটেনি। কেউ তাকে খুন করেছে!"

শনিবার সারাদিনটা মিতিনমাসির টিকি দেখতে পাওয়া গেল না। সকাল ন'টার মধ্যে নাকেমুখে গুঁজে সেই যে বেরিয়ে গেল মিতিনমাসি, ফিরল সেই সন্ধের মুখেমুখে। কোথায় গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল, কিছুই বলল না টুপুরকে। প্রশ্ন করলে একটাই জবাব — কাজ ছিল। এমনই দু'-চারটে কথা বলে ঢুকে গেল স্নানে, বেরিয়ে সোজা স্টাডিরুম। সাপের উপর বই কিনে এনেছে খানদুয়েক, দরজা ভেজিয়ে ডুবে গেল বইয়ের পাতায়।

রাতে খেতেও বসল একটা বই নিয়ে। পড়তে পড়তেই খাচ্ছিল, হঠাৎ মুখ তুলে পার্থমেসোকে বলল, "কাল একটু ভাল করে বাজার কোরো তো। দিদি আর অবনীদাকে দুপুরে খেতে বলেছি।"

পার্থ অবাক, "হঠাৎ?"

"আমার ইচ্ছে। দিদি-জামাইবাবুকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াব, তাতে আবার হঠাতের কী আছে?"

পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "কী আনব? চিকেন? না মটন?"

"উঁহু। ইলিশমাছ। দিদি ইলিশমাছটা বড্ড ভালবাসে। মনে করে পুঁইশাকটাকও এনো। কাঁটাচচ্চড়ি হবে। আর ভাল হিমসাগর আম। সঙ্গে মিষ্টি দই।"

"ও কে।"

টুপুর চুপচাপ শুনছিল। বেজার মুখে বলল, "কালই মা-বাবাকে না ডাকলে চলছিল না?"

মিতিন চোখের কোণ দিয়ে দেখল টুপুরকে, "কেন, তোর কী অসুবিধে হল?"

"মা তো এসেই হোমওয়ার্ক নিয়ে পড়বে। এখনও বইখাতা খুলিনি শুনলে রক্ষে রাখবে?"

"তা হোমওয়ার্কগুলো করছিস না কেন? আজ সারাদিন বসে কী ভ্যারেন্ডা ভাজছিলি?"

টুপুর একটু আহত হল, তবে মুখ ফুটে বলল না কিছু। সারাদিন আজ গড়াগড়ি খাওয়া ছাড়া কিছুই করেনি বটে, কিন্তু কেন যে কিছু করেনি, কিংবা করতে মন লাগেনি, তা তো মিতিনমাসি একবার জিজ্ঞেস করল না!

কালকের দিনটাই বারবার ঘুরে এসেছে টুপুরের চোখে। নীলাম্বরের নিষ্প্রাণ দেহ, পুরন্দরের নির্জন পাড়, রতন হেনরি মণ্ডল, সুমন্ত্র সান্যালের নিঝুম বসে থাকা...। আচ্ছা, মিতিনমাসি কী করে নিশ্চিত হল, নীলাম্বর খুন হয়েছে? এটা অবশ্য ঠিক, সাপের ছোবল খেয়ে তার বাড়িতে ছুটে আসাটাই স্বাভাবিক ছিল। বিশেষ করে যখন সে জানে তার স্যারের কাছে সাপের বিষের ওষুধ থাকে। ভয় পেয়ে গিয়েছিল? উঁহুঁ, নীলাম্বরের তো সাপদের সঙ্গেই নিত্য ওঠাবসা। অবশ্য ডক্টর সান্যালের যুক্তিটাও ফ্যালনা নয়। বিপদের সময় আচ্ছা আচ্ছা সাহসী লোকেরও বুদ্ধিভ্রম ঘটতে পারে। আর কী পয়েন্ট খুঁজে পেল মিতিনমাসি? কাকভোরে পুরন্দরের পারে হাঁটতে

যাওয়াটা কি মিতিনমাসির অস্বাভাবিক ঠেকেছে? উঁহুঁ, ফাদার ম্যাথুও তো ওই পথে হাঁটতে যান! নীলাম্বরের পকেট থেকে কিছু পাওয়া গেছে কিনা বারবার জিজ্ঞেস করছিল মিতিনমাসি। কেন?

ভেবেভেবে তল পায়নি টুপুর। তবে দিনটা তো চলেই গিয়েছে। এবং মা-ও এসে কাল চেঁচাবেনই।

পরদিন সকালে অবশ্য টুপুরকে ঝাড় খেতে হল না। সহেলি আর অবনী যখন মিতিনদের ফ্ল্যাটে ঢুকলেন, ঠিক তখনই ইলিশমাছ ছাড়া হয়েছে কড়ায়। মনোলোভা আঁশটে গন্ধে ম-ম করছে চারদিক। ব্যস, সঙ্গেসঙ্গে সহেলি দুনিয়া ভুলেছেন।

জোরে জোরে শ্বাস টেনে সহেলি বললেন, "মাছটার কোয়ালিটি খুব ভাল মনে হচ্ছে!"

পার্থর মুখ হাসিতে ভরে গেল, "কে এনেছে দেখতে হবে তো। খোদ পদ্মার মাছ। দু'কিলো একশো ওজন। পেটে হাল্‌কা ডিমের ছাঁচ আছে।"

অবনী মৃদু স্বরে বললেন, "ইলিশমাছ কিন্তু হজম করা কঠিন। বেশি খেলে পেটের গন্ডগোল হয়।"

"তোমায় একটাও খেতে হবে না।" সহেলি ঝামরে উঠলেন, "তুমি পেঁপের ডালনা খেয়ো।"

"উত্তম প্রস্তাব। পেঁপের মতো উপকারী সবজি আর ক'টা আছে! জানো, পেঁপের আঠা থেকে পেপ্‌টিক আলসারের ওষুধ তৈরি হয়?"

"আর ইলিশ খেলে হার্ট ভাল থাকে। কোলেস্টেরল কমে যায়।"

পার্থ ফুট কাটল, "এবং চিত্ত প্রফুল্ল হয়।"

"বলো, বলো। বেরসিক লোকটাকে বোঝাও। কী যে একটা পেটরোগা লোকের সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন!

নানাবিধ চাপানউতোর আর হাসি-মশকরার মাঝে চাপা পড়ে

গেল টুপুরের হোমটাস্ক। শুরু হয়েছে মাথামুন্ডুহীন গুলতানি। অবনী ইদানীং সামাজিক হয়েছেন কিছুটা। মোটামোটা বই ছেড়ে আড্ডাটাড্ডাও মারছেন মাঝেমধ্যে।

শ্যালিকার পিঠে একটা চাপড় মেরে অবনী জিজ্ঞেস করলেন, "তা মিতিনবাবু, তোমার 'থার্ড আই' চলছে কেমন? নতুন কেসটেস কিছু জুটল?"

পার্থ জবাব দিল, "মিতিনের এখন ডাল সিজন। লড়ে লড়ে একটা কেস জোগাড় করেছে বটে, তবে তাতে আদৌ রহস্য আছে কিনা বলা কঠিন।"

"বাজে বোকো না তো। যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং কেস," মিতিন চোখ পাকাল, "এবং ওই কেসের সঙ্গে আমাদের দেশের স্বার্থও জড়িত।"

"বলো কী! ব্যাপারটা তো তা হলে শুনতে হয়!"

সংক্ষেপে সুমন্ত্র সান্যালের গল্পটা বলল মিতিন। রজার হারিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে নীলাম্বরের মৃত্যু পর্যন্ত।

মন দিয়ে শুনে অবনী বললেন, "হুম, মিস্ট্রি একটা থাকলেও থাকতে পারে।"

সহেলি ফ্রিজ থেকে একখানা বোতল বার করে ঠান্ডা জল খাচ্ছিলেন। কিছুই শোনেননি তিনি, তবু ফস করে আলটপকা মন্তব্য ছুড়লেন, "মিস্ট্রি মাথায় থাকুক। সাপটাপের ব্যাপারে মিতিনের যাওয়ার কোনও দরকার নেই।"

"দিদি, থাম তো। তুই বরং গিয়ে ভারতীকে একটু গাইড কর রান্নায়।" মিতিন ফের ফিরল প্রসঙ্গে, "বুঝলেন অবনীদা, ওই নীলাম্বরের মৃত্যুটাই আমায় টেনশনে ফেলে দিয়েছে।"

টুপুরেরও তো একই টেনশন। সুযোগ পেয়েই টুপুর প্রশ্নটা উগরে দিল, "একটা কথা বলব মিতিনমাসি? তুমি কেন মানতে চাইছ না, নীলাম্বরকে সাপে কেটেছে?"

"একটা মেজর কারণ তো চোখকান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। নীলাম্বরের ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে কখন? ভোর সাড়ে পাঁচটা-পৌনে ছ'টায়। রতন হেনরি মণ্ডলের বক্তব্য অনুযায়ী, তখন নীলাম্বরের বডি স্টিফ। তার মানে রিগর মর্টিস তখন স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যু হয়েছে কম করে আরও ঘণ্টাচারেক আগে। দ্যাট মিন্‌স, রাত একটা-দেড়টার পরে নয়। তা অত রাতে নীলাম্বর বেরিয়ে পুরন্দরের ধারে গেল কেন? কেউ তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল কি? নাকি নীলাম্বরই কারও সঙ্গে ওখানে রাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল? আর এখানেই খুনের একটা আশঙ্কা এসে যায় না কি? তবে নীলাম্বরের মৃত্যুটা যে খুন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ...," মিতিন আচমকা থেমে গেল।

পার্থ উত্তেজিতভাবে বলল, "কী? বড় প্রমাণটা কী?"

"ওটা এখন সাসপেন্স থাক। পরে বলব।" মিতিন গাল ছড়িয়ে হাসল। অবনীর দিকে ফিরে বলল, "আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা ছিল।"

"বলে ফ্যালো।"

"আপনার বয়স তো এখন চুয়াল্লিশ চলছে। তাই না? যদি না আপনি বিয়ের সময় বয়স ভাঁড়িয়ে থাকেন..."

"ফাজলামি মেরো না। ওসব দু'নম্বরি অভ্যেস আমার নেই।"

"ভেরি গুড। তা আপনি এম এ পাশ করেছেন কদ্দিন আগে?"

"বছরকুড়ি।"

"বায়োকেমিস্ট্রিতে এম এসসি, আপনার সমসাময়িক, এমন কারও সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?"

অবনী ভুরু কুঁচকোলেন, "আমাদের সময় কি ইউনিভার্সিটিতে আদৌ বায়োকেমিস্ট্রি ছিল? উঁহুঁ। ওটা বোধহয় পরে এসেছে।"

"তবে কী ছিল তখন?"

"পিয়োর কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি। ওখান থেকেই অনেকে পরে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করত।"

"ও।" মিতিন যেন সামান্য দমে গেল, "কেমিস্ট্রির কেউ চেনা আছেন?"

"অনেকেই আছে। আমাদের কলেজের দেবেশই তো আমার ইয়ারে এম এসসি করেছে।"

দু'-এক পল কী ভাবল মিতিন। বলল, "দেবেশবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলা যায়?"

"স্বচ্ছন্দে। যদি চাও তো তাকে এখানেই হাজির করতে পারি।"

"আহা, উনি কষ্ট করে আসবেন কেন? আমিই যাব।"

"আরে না না, তোমার আমন্ত্রণে সে খুশিই হবে। আমার মুখে তোমার কীর্তিকাহিনী শুনে শুনে সে তো রীতিমতো তোমার ফ্যান। কাছেই থাকে। সেলিমপুর। দাঁড়াও, এখনই দেবেশকে একটা ফোন লাগাই।"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়লেন দেবেশ। ফরসা দোহারা চেহারা, মাথাজোড়া টাক, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, পরনে ছুটির দিনের ঢিলেঢালা পাজামা-পাঞ্জাবি। মিতিনকে দেখামাত্র এমন গদগদ সুরে কথা বলতে লাগলেন যে, রীতিমতো কুঁকড়ে গেল মিতিন। স্তুতিবাক্যের কী ঘটা! মিতিন যেন শার্লক হোম্‌সের মহিলা এডিশন!

চটপট দেবেশকে চা-ফ্রেঞ্চটোস্ট ধরিয়ে দিয়ে মিতিন সরাসরি কাজের কথায় এল, "বাই এনি চান্স, এম এসসি পড়ার সময় সুমন্ত্র সান্যাল বলে কাউকে আপনি চিনতেন?"

"সুমন্ত্র... সুমন্ত্র...?"

"হ্যাঁ। লম্বা মতো... রোগা মতো... বিশাল খাড়া নাক...?"

"ওহো, আপনি লম্বুর কথা বলছেন? আমেরিকায় ছিল? এখন দেশে ফিরে রিসার্চ করছে?"

"চেনেন?"

"আরে, ও তো কলেজেও আমার ব্যাচমেট ছিল। এম এসসি-তে সুমন্ত্র স্পেশ্যাল পেপার নিল অরগ্যানিক, আমি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি। এককালে ওর সঙ্গে ভালই দোস্তি ছিল।"

"সুমন্ত্রবাবুকে নিয়ে রিসেন্টলি একটা খবর বেরিয়েছিল পড়েছেন?"

"কবে বলুন তো?"

"এই তো, মঙ্গলবার।"

"উঁহুঁ। মিস করে গিয়েছি। পার্ট-ওয়ানের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা চলছে তো, সকালে খবরের কাগজ দেখার সময়ই পাই না। কী করেছে সুমন্ত্র? কোনও প্রাইজটাইজ পেয়েছে বুঝি?"

"না। উনি নিখোঁজ হয়েছিলেন।"

"অ্যাঁ?" দেবেশের মুখ হাঁ, "সুমন্ত্র... নিখোঁজ...?"

"এখন ফিরে এসেছেন। ইনসিডেন্টালি, ওঁকে খোঁজার কাজে আমি সামান্য জড়িয়ে পড়েছিলাম।"

"তাই বলুন।"

"সুমন্ত্রবাবু সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই। ...সুমন্ত্রবাবু মানুষটা কেমন?"

"এখনকার সুমন্ত্রর কথা বলতে পারব না। আমার সঙ্গে দীর্ঘকাল কোনও যোগাযোগ নেই। দেশে ফেরার পর সুমন্ত্রও আর সম্পর্কটা রিভাইভ করেনি, আমিও কনট্যাক্ট করিনি।"

"বেশ তো, আগের সুমন্ত্রবাবুর কথাই বলুন।"

"সুমন্ত্র ছিল একটু আত্মকেন্দ্রিক। নিজেকে নিয়ে, নিজের পড়াশোনা নিয়ে থাকতেই বেশি ভালবাসত। তবে খারাপ ছেলেও নয়। কথাবার্তায় খুবই ভদ্র, সভ্য। প্লিজিং পার্সোনালিটি। মেধার দিক দিয়ে মাঝামাঝি, তবে অসম্ভব স্টুডিয়াস আর সিস্টেমেটিক।

ব্রিলিয়ান্ট ছিল ওর ভাইটা। জয়েন্টে হাই র‍্যাঙ্ক করে মেডিক্যালে অ্যাডমিশন পেয়েছিল। কিন্তু কী বলব, পরে অসৎ সঙ্গে পড়ে একেবারে বখে গিয়েছিল ছেলেটা। কলেজে পড়ার সময় এক-দু'বার গিয়েছি সুমন্ত্রদের মল্লিকপুরের বাড়িতে। তখনও ছেলেটা মেডিক্যাল কন্টিনিউ করছে। কিন্তু তখনই দিনরাত ড্রাগে চুর হয়ে থাকত। সুমন্ত্র ছিল তুলনায় অনেক ব্যালান্সড। ফ্যামিলির অবস্থা ভাল নয় বলে প্রাণ দিয়ে খাটত। বি এসসি'-তে হাই ফার্স্ট ক্লাস পেল সুমন্ত্র, আর ভাইটি থার্ড ইয়ারেই লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে কী এক ইংরিজি গানের ট্রুপ খুলে বসল। কী যেন নাম ছিল ভাইটার? ...হ্যাঁ হ্যাঁ, সুধন্য। এমন নেশার কবলে পড়েছিল যে, নিজের বাড়ির ঘটিবাটি বেচে দিত। চুরির কেসে বোধহয় ধরাও পড়েছে বারকয়েক। এম এসসি পড়ার সময় দেখেছি, ভাইকে নিয়ে সুমন্ত্র ভারী ওয়ারিড থাকত।"

"কিন্তু তিনি তো শুনলাম এখন বাঙ্গালোরে চাকরি করছেন!"

"তাই নাকি? আমি যেন অন্যরকম শুনেছিলাম। কী এক মেডিক্যাল ফার্মে কাজ পেয়েছে, ওষুধটষুধ বেচছে। ...তা বাইরে গিয়ে সেটেল্‌ড হয়ে থাকলে তো আরও ভাল। সুধন্য বিয়ে-থা করেছে?"

"তা তো বলতে পারব না।"

অবনী পাশ থেকে হেঁকে উঠলেন, "দেবেশ, প্রশ্ন কার করার কথা, অ্যাঁ?"

দেবেশ লজ্জিত মুখে বললেন, "না না, সুধন্যর কথা উঠল, তাই...। বলুন ম্যাডাম, আর কী জিজ্ঞাস্য আছে?"

"আপনার কথা শুনে তো বুঝতেই পারছি সুমন্ত্রবাবু দেশে ফেরার পর তাঁর সঙ্গে আপনার আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি!"

"একটি বারের জন্যও না। ইনফ্যাক্ট, ও যে আবার দেশে

ফিরেছে, সুন্দরবনের দিকে কোথায় গিয়ে যেন কাজকর্ম করছে... এও তো জানলাম মাত্র বছরখানেক আগে। আমাদের আর-এক ব্যাচমেট পরিমল, সে এখন দিল্লির সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মিনিস্ট্রির হোমরাচোমরা। তার কাছেই ইনফর্মেশন পেলাম। ...পরিমলের সঙ্গে দেখা হওয়াটাও একটা নাটকের মতো। লাস্ট সামারে বউ-ছেলে নিয়ে গোয়া বেড়াতে গিয়েছি, হঠাৎ কালাংগুটে বিচে সুইমিং কস্টিউম পরা এক লোমশ জলহস্তী ইয়া ভুঁড়ি নিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল, 'আরে দেবু, তুই এখানে!' পাক্কা পাঁচ মিনিট টাইম লেগেছিল আমার পরিমলকে চিনতে। ইউনিভার্সিটির শুঁটকো পরিমল যে কোন ম্যাজিকে...!"

অবনী গলাখাঁকারি দিলেন, "তুমি ভুল ট্র্যাকে ঢুকে পড়েছ, দেবেশ।"

"সরি। সরি।" দেবেশ জিভ কাটলেন, "এই আমার এক বদভ্যাস। ক্লাসেও এরকম হয় জানেন। শুরু করলাম হয়তো গ্যাসের গতিতত্ত্ব, পড়াতে পড়াতে তাপগতিবিদ্যায় চলে গেলাম। হয়তো চাপের সমীকরণটা বার করছি... মানে প্রেশার আর গ্যাস মলিকিউলের ভেলোসিটির রিলেশন..."

"ফের বেলাইন? কপাল ভাল, আমার শ্যালিকার হাতে পড়েছ, পুলিশের খপ্পরে নয়। স্টেটমেন্ট দেওয়ার সময় এমন ফালতু বকবক করলে তারা তোমার ঠোঁট সেলাই করে দিত।"

"আহা, উনি ওঁর মতো করেই বলুন না।" মিতিন হাসছে, "গল্প শুনতে শুনতে কত কিছু তো জানাও হয়ে যাচ্ছে। ...দেবেশবাবু, ডক্টর সান্যালের বাবা-মা বেঁচে আছেন কিনা জানেন?"

"নেই। পরিমলের মুখেই শুনলাম, সুমন্ত্র আমেরিকায় থাকাকালীনই ওর মা গত হন। দেশে ফেরার পর ওর বাবা।"

"তা হলে মল্লিকপুরের বাড়িতে নিশ্চয়ই এখন আর কেউ নেই?"

"ভাই যদি বাঙ্গালোরে চলে গিয়ে থাকে, তা হলে আর কে থাকবে! হয়তো তালাবন্ধ। অনেক কালের পুরনো বাড়ি তো, হয়তো বেচেও দিয়ে থাকতে পারে। বাড়ির লাগোয়া বেশ খানিকটা জমিও ছিল। প্রোমোটাররা লুফে নেবে। অবশ্য বাড়িটা স্টেশন থেকে অনেকটাই ভিতরে। রিকশায় তেঁতুলতলা না, তেঁতুলগাছি কোন একটা মোড়ে গিয়ে যেন নামতে হয়। সেই কবেকার কথা, অত কী আর মনে থাকে!" বলতে বলতে দেবেশ হঠাৎই থমকেছেন। চোখ পিটপিট করে বললেন, "আচ্ছা, এসব ইনফর্মেশন তো সুমন্ত্রই আপনাকে দিতে পারে। আপনি তো বললেন, নিখোঁজ হওয়ার পর ও আবার ফিরে এসেছে!"

আলতো হেসে মিতিন এড়িয়ে গেল কথাটাকে।

দেবেশের ভুরুতে ভাঁজ, "সুমন্ত্র কি কোনও গন্ডগোল পাকিয়েছে?"

এবারও মিতিন এড়িয়ে গেল কায়দা করে। বলল, "গন্ডগোল একটা পেকেছে বটে। সেটা উনিই পাকিয়েছেন কিনা জানি না। তবে গন্ডগোলটা ওঁকে ঘিরেই। ...বাই দ্য বাই, সুমন্ত্রবাবুর টাকাপয়সার ব্যাপারে বেশি আসক্তি ছিল কি?"

"না না না। চিপ্পুস টাইপ ছিল। মেপেজুপে খরচ করত। তা বলে টাকার জন্য মোটেই হ্যাঙ্কারিং ছিল না। তা ছাড়া ম্যাডাম, সুমন্ত্র যদি লোভীই হবে, তা হলে কি আমেরিকার ঐশ্বর্য ছেড়ে এখানে কাজ করতে চলে আসে? বউ-মেয়ে সব ফেলে?"

"তা ঠিক। আমারও ধারণা উনি সন্ন্যাসী ধরনের মানুষ।"

সুমন্ত্রকে নিয়ে আর কথা হল না বিশেষ। আধঘণ্টাটাক আরও গল্পগুজব করে উঠলেন দেবেশ। দুপুরে ভোজনপর্বটি বেশ ভালই হল। সহেলির পীড়াপীড়িতে দই-ইলিশ খেয়ে সারাটা দুপুর চোঁয়া ঢেকুর তুললেন অবনী। সহেলি চুটিয়ে পরনিন্দা পরচর্চা করলেন মিতিন আর পার্থর সঙ্গে।

বিকেলে যাওয়ার সময় সহেলি ধরেছেন টুপুরকে, "কী, এখনও তো বইখাতা ছোঁওয়া হয়নি মনে হচ্ছে?"

টুপুর বলল, "এই... কাল থেকে বসব।"

"গৃহে পদার্পণ করছ কবে?"

"এখনও তো অনেক দিন ছুটি বাকি আছে মা।"

"তা হোক। চোখের আড়ালে থাকলে তুমি ডানা মেলে উড়বে। একটা কথা মাথায় রেখো, মাসির সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি করলেই শুধু চলবে না। ভুলে যেয়ো না, তোমার মাসিও স্কুল-কলেজ পাশ করে তবে এ লাইনে এসেছে। ছেলেবেলা থেকেই কারও ল্যাংবোট হয়ে নেচে বেড়ায়নি।"

বাড়ি ফাঁকা হল। সন্ধে নেমেছে। আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ জমেছে অল্প অল্প। হঠাৎ হঠাৎ ঝিলিক হানছে বিদ্যুৎ। আজ আবার কালবৈশাখী আসবে কি? টুপুরের মনে হল, এখন একটা ঝড়বৃষ্টি হলে মজাই হয়। দিনভর যা চিটপিটে গরম গেল!

পার্থমেসো বুমবুমকে নিয়ে সামনের দোকান থেকে ভিসিডি আনতে গেল। হ্যারি পটার দেখবে বলে বায়না ধরেছে বুমবুম। কী যে সব আজগুবি দেখে বসে বসে! এই ছিল মানুষ, এই হয়ে গেল পাখি! শূন্যে ছেলেমেয়েরা উড়তে উড়তে খেলে বেড়াচ্ছে! ইন্দ্রজালের স্কুলে মেয়েরা তালিম নিচ্ছে ডাইনি হওয়ার! টুপুরের তো দেখলেই হাসি পায়। মিতিনমাসির সঙ্গে থেকে থেকে সে এখন অযৌক্তিক কিছু ভাবতেই পারে না।

ব্যালকনি ছেড়ে টুপুর ঘরে এল। মিতিনমাসি শুয়ে পড়েছে বিছানায়। চোখ বন্ধ, কী যেন চিন্তা করছে।

টুপুর মাথার পাশে এসে বসল, "কী গো, দেবেশকাকুর সঙ্গে কথা বলে কিছু লাভ হল?"

"তা একটু হয়েছে বই কী।"

"কীরকম?"

মিতিন সরাসরি জবাব দিল না। চোখ থেকে হাত সরিয়ে সুর করে বলল, "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দ্যাখো তাই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন!"

পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে পাউরুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে মিতিন বলল, "টুপুর, আজ দুপুরে তোকে আমার সঙ্গে বেরোতে হবে।"

টুপুরের হৃৎপিণ্ড ছলাত করে উঠল, "কোথায় যাব গো?"

"উত্তেজিত হোস না। গেলেই দেখতে পাবি।"

"আবার কি বাসন্তী যাব আমরা?"

"না।"

ব্যস, মিতিনের মুখে আর বাক্যিটি নেই। কচরকচর বাটার টোস্ট চিবিয়ে চায়ের কাপ হাতে সোজা বসার জায়গায়। অনিশ্চয় মজুমদারকে ধরেছে ফোনে। বারবার অনুরোধ করল, অনিশ্চয় যেন স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে অতি সত্বর ময়নাতদন্তের রিপোর্টটা সংগ্রহ করেন। সম্ভব হলে আজই। কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে আঙুল বাজাচ্ছে টেবিলে। এই মুদ্রাটা টুপুরের চেনা। কোনও সিদ্ধান্ত নিতে দোলাচল থাকলে মিতিনমাসি এভাবেই টেবিলে আঙুল ঠুকে তবলা বাজায়।

আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে মিতিন বলল, "না, থাক।"

পার্থ বড় সোফায় বসে শব্দজব্দ করছিল। খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই প্রশ্ন করল, "কী থাকবে?"

"বাসন্তী থানায় একটা ফোন করব কিনা ভাবছিলাম।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "তাদের সঙ্গে আবার কী দরকার?"

"ওসিকে বললে হত রতন হেনরি মণ্ডলকে একটা মেসেজ দিতে।"

"কী জানাবে?"

"যেন সে অতি অবশ্যই আমাকে আজ একবার ফোন করে। এখন অবশ্য মনে হচ্ছে তার আর প্রয়োজন নেই।"

রতনকে মিতিনমাসির কী কাজে লাগতে পারে, ভেবে পেল না টুপুর। সত্যি, মাসির চিন্তার গতিপ্রকৃতি খুঁজে পাওয়া ভার। কাল রাতে হ্যারি পটার দেখতে দেখতে হঠাৎ ফোন লাগাল বাবাকে। তখনই দেবেশকাকুর টেলিফোন নম্বর চাই!

কথাও বলল দেবেশকাকুর সঙ্গে। ওই রাত পৌনে বারোটায়। দু'জনে কী যে বাক্যালাপ হল কে জানে, ফোন রেখে দিয়ে মিতিনমাসির মুখ খুশিতে জ্বলজ্বল। যাক গে, অত সাতপাঁচ ভেবে লাভ কী, মিতিনমাসি আজ অভিযানে টুপুরকে সঙ্গে নিচ্ছে এই না ঢের!

স্নান-খাওয়া সেরে কাঠফাটা দুপুরে বেরিয়ে পড়ল টুপুর আর মিতিন। সূর্য খাড়া মাথার উপর, চাঁদি ফেটে যাচ্ছে তাপে, মিতিনের এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই। আশমানি রং সালোয়ার কামিজ পরেছে, কাঁধে পেটমোটা ভ্যানিটি ব্যাগ, চোখে সানগ্লাস, মাথায় ছাতা। হাঁটছে গটগট।

ঢাকুরিয়া স্টেশনে এসে টুপুরকে দাঁড় করিয়ে রেখে দু'খানা ট্রেনের টিকিট কেটে আনল মিতিন। ক্যানিং লোকাল ছেড়ে দিয়ে চড়ল ডায়মন্ডহারবারগামী গাড়িতে। হালকা হালকা ভিড়ের কামরায়।

ট্রেনে উঠে টুপুর ফের জিজ্ঞেস করল, "এবার কি জানতে পারি আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"মল্লিকপুর।"

"নিশ্চয়ই ডক্টর সান্যালদের বাড়িতে?"

"হ্যাঁ।"

"ওখানে কাকে পাবে?"

"দেখা যাক।"

"বিকেল বিকেল বেরোলে ভাল হত না? রোদ পড়ার পর?"

"না। একদমই দেরি করা চলবে না। পাখি উড়ে যেতে পারে।"

"কে পাখি? কী পাখি?"

"ধীরে, বৎস, ধীরে, সময়কালে সব জানতে পারবে।"

মিতিনের ঠোঁটে ফের তালাচাবি। ঢাকুরিয়া থেকে মল্লিকপুর মিনিটপঁচিশেকের পথ। সারাক্ষণ ট্রেনের বাইরে মেলে আছে চোখ। মল্লিকপুরে নেমে স্টেশন চত্বরের বাইরে এল। রিকশাস্ট্যান্ডে।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে স্ট্যান্ড প্রায় ফাঁকা। একটা মাত্র রিকশায় হুড তুলে সিটে বসে ঢুলছে এক বৃদ্ধ।

মিতিন সামনে এসে গলাখাঁকারি দিল, "ও দাদা? যাবেন তো?"

লোকটা ধড়মড় করে জেগেছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, "কোথায় যাবেন?"

"তেঁতুলতলা।"

"তেঁতুলতলা? ও নামে তো কোনও জায়গা নেই!"

"তেঁতুলগাছি?"

"নাঃ, তেঁতুলিয়ার মোড় একটা আছে। অনেক দূর। আট টাকা ভাড়া।"

"চলুন। মনে হচ্ছে তেঁতুলিয়াই হবে।"

স্টেশনবাজার ছেড়ে এগোল রিকশা। বড় রাস্তা ছেড়ে ঘুরল ডান দিকে। এঁকেবেঁকে এপাড়া ওপাড়া পেরিয়ে পাক্কা বারো মিনিট পর এক তেমাথার মোড়ে এসে থেমেছে।

ভাড়া মিটিয়ে এপাশ ওপাশ দেখল মিতিন। দোকানপাট আছে বটে, তবে গ্রীষ্মের দুপুরে সবই বন্ধ। একটা মাত্র চায়ের দোকানই যা খোলা। আধখানা ঝাঁপ ফেলে, উনুন নিভিয়ে, ভিতরের বেঞ্চিতে ঘুমোচ্ছে এক মাঝবয়সি মানুষ।

মিতিন একটু ভাবল। তারপর নিচু হয়ে ঢুকল দোকানটায়। ডাকল, "ও মশাই? শুনছেন?"

"উঁ?" বেজার মুখে চোখ খুলল লোকটা।

"এখানে সান্যালদের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন?"

"কোন সান্যাল?"

"ওই যে লম্বামতো... দু'ভাই... একজন বিজ্ঞানী, বিদেশে থাকতেন..."

"বুঝেছি। সোনাদা-রুপোদাদের বাড়ি।" লোকটা গামছায় ঘাড় গলা মুছতে মুছতে উঠে বসেছে, "আপনারা বুঝি সোনাদার কাছে এসেছেন?"

"হ্যাঁ মানে ...," মিতিন চোখ থেকে সানগ্লাস খুলল, "মানে একটা দরকার ছিল।"

"দেখা হবে কি? সোনাদা তো এখন শয্যাশায়ী।"

"কী হয়েছে?"

"বেশি নেশাটেসা করলে যা হয়। ...শুনলাম তো, দিনকয়েক হল আর উঠতে নড়তেও পারছে না। কলকাতার এক বন্ধু এসে দেখাশোনা করছে। প্রায় রোজই তো ডাক্তার আসতে দেখি," আড়মোড়া ভেঙে কথাগুলো বলতে বলতে লোকটা হঠাৎ সচকিত। চোখ সরু করে একবার মিতিনকে দেখল, একবার

টুপুরকে। সতর্ক গলায় বলল, "কিন্তু আপনারা কে? সোনাদার আত্মীয়?"

মিতিন ঝটিতি বলে উঠল, "আমি ... ডক্টর সুমন্ত্র সান্যাল, মানে আপনাদের রুপোদার আন্ডারে কাজ করি। গবেষণা। উনি আমার হাত দিয়ে ভাইকে কিছু টাকা পাঠিয়েছেন।"

"ও, বুঝেছি। চিকিৎসার জন্য। তা রুপোদা এবার নিজে এল না কেন? ভাইয়ের অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখে যেত।"

"কাজেকর্মে খুব ব্যস্ত। আমি কাছেই থাকি। সোনারপুরে। তাই...।"

"কাগজে তো রুপোদাকে নিয়ে খুব শোরগোল পড়েছিল দেখলাম। তিন-চার দিনের জন্য কোথায় যেন চলে গিয়েছিল রুপোদা..."

"উনি একটু কাজে গিয়েছিলেন। কাগজওয়ালারা বাড়িয়ে লিখেছিল।"

"আমরাও তো এখানে সেই আলোচনাই করছিলাম। খেয়েদেয়ে কাজ নেই, রুপোদার মতো ঠান্ডা মাথার মানুষ হঠাৎ কাজ ফেলে নিরুদ্দেশে যাবে!"

"তা আপনাদের সোনাদার বাড়িটা...?"

"সামনের গলি ধরে সোজা ঢুকে যান। ডাইনে প্রথম যে পুকুর পড়বে, তার পিছনে উঁচু পাঁচিলওয়ালা দোতলা বাড়ি।"

ভাঙাভাঙা ইট ফেলা এবড়োখেবড়ো রাস্তা। টুপুর হাঁটতে হাঁটতে বলল, "এটা কী রকম হল মিতিনমাসি? ডক্টর সান্যাল আমাদের মিথ্যে বললেন? ওঁর ভাই বাঙ্গালোরে যায়নি?"

"তাই তো দেখা যাচ্ছে।"

"আমার মনে হয়, পুলিশ বা মিডিয়ার কাছে নেশাখোর ভাইয়ের কথা বলতে চাননি। চাপা দেওয়ার জন্য বাঙ্গালোর টাঙ্গালোর বলে..."

"চটজলদি কোনও সিদ্ধান্তে আসিস না। এখন তাড়াতাড়ি চল।"

গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে মিনিটতিনেক লাগল। চায়ের দোকানের

লোকটা যাকে পুকুর বলেছিল, আদতে সেটা পানা বোঝাই এক এঁদো ডোবা। সান্যালবাড়িটিও অতি প্রাচীন। দশা অকহতব্য। প্লাস্টারটাস্টার তো কবেই খসে গিয়েছে, দেওয়ালে শ্যাওলার কালচে ছোপ, ছাদের আলসেতে শিকড় ছড়িয়েছে বট-অশ্বত্থের চারা। বাড়িটা কি ক্লাইভের আমলে তৈরি?

ভারী গেট ঠেলে মিতিন আর টুপুর ভিতরে এল। চারপাশের ফাঁকা জমিতে ঘাস-আগাছার জঙ্গল। নির্ঘাত কস্মিনকালে পরিষ্কার করা হয় না। বাড়ি ঘিরে গোটাচারেক বড় গাছ এলোমেলো দাঁড়িয়ে। আম, কাঁঠাল, নিম। ঝাঁকড়া গাছগুলোর দৌলতে জায়গাটা বেশ ঠান্ডাঠান্ডা। ছায়া মাখা।

তিন ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে লাল মেঝের টানা বারান্দা। আট ফাটা। ধুলোয় ভরা। দু'ধারে দু'খানা রোয়াকও আছে। লাল রঙেরই। ভাঙা-ভাঙা। বারান্দার মাঝামাঝি বাড়ির সদর দরজা। বন্ধ। খড়খড়িওয়ালা লম্বা লম্বা জানলাগুলোও খোলা নেই একটাও। না একতলায়, না দোতলায়।

মোটা কাঠের ধূসর দরজাখানার পাশে ডোরবেল খুঁজছিল মিতিন। আচমকাই খুলে গিয়েছে পাল্লা। দরজা জুড়ে দশাসই চেহারার এক লুঙ্গি-পাঞ্জাবি। প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা, একমাথা কোঁকড়া চুল, ধ্যাবড়া নাক, গায়ের রং আলকাতরাকেও লজ্জা দেয়। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ।

ভারিক্কি স্বরে লোকটা বলল, "কী চাই?"

মিতিন ঠান্ডা গলায় বলল, "আমরা সুধন্য সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"সুধন্য ঘুমোচ্ছে। ওর শরীর ভাল নেই।"

"কী হয়েছে সুধন্যবাবুর?"

"বললাম তো, অসুস্থ।"

"কী অসুখ?"

লোকটার দৃষ্টি রুক্ষ হল। নিরীক্ষণ করছে মিতিন-টুপুরকে। গলা আরও ভারী করে বলল, "কোত্থেকে আসছেন বলুন তো?"

"বাসন্তী। ডক্টর সুমন্ত্র সান্যাল পাঠিয়েছেন।"

মুহূর্তের জন্য যেন চমকাল লোকটা। কোনও একটা ধন্দেও পড়েছে মনে হল। পরক্ষণেই অবশ্য সামলে নিয়েছে নিজেকে। গলা ঝেড়ে বলল, "দেখা করার অনুমতি নেই। ডাক্তারবাবুর বারণ।"

"আমরা ওঁকে ডিস্টার্ব করব না। জাস্ট দেখা করেই চলে যাব।"

"আঃ, কেন ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন? বলছি তো হবে না। আপনারা আসুন।"

বলেই লোকটা মুখের উপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

টুপুর রাগরাগ মুখে বলল, "আচ্ছা বেয়াদব লোক তো!"

মিতিনের ঠোঁটে চোরা হাসি, "চল, ফিরি। আমার যা বোঝার বুঝে গিয়েছি। এবার আসল কাজে নামব।"

দ্রুত পায়ে মোড়ে এসে টুপুররা দেখল, সবেধন নীলমণি সেই রিকশা এখনও দাঁড়িয়ে। উঠে সিটে বসতেই চা-দোকানের লোকটা বেরিয়ে এসেছে, "কেমন দেখলেন সোনাদাকে?"

মিতিন মুখটাকে করুণ করে বলল, "ভাল নয়।"

"রুপোদাকে বলুন না, ভাইকে বাড়িতে ফেলে না রেখে ভাল হাসপাতালে দিয়ে দিক। অপোগণ্ড ভাইটার জন্য এত কিছু করেন, নয় এই দায়টুকুও নিলেন।"

"বলব।"

মিতিনমাসির ব্যাপারস্যাপার আচার-আচরণ সব কেমন হেঁয়ালির মতো লাগছিল টুপুরের। তবে একটা জটিল কোনও

ধাঁধা যে চলছে, তাতে কোনও দ্বিমত নেই। এবং তার সমাধানটাও মিতিনমাসি পেয়ে গিয়েছে।

স্টেশনে পৌঁছেও টুপুর এতাল-বেতাল ভাবছিল। ট্রেন আসতে দেরি হচ্ছে, প্ল্যাটফর্মের শেডের নীচে দাঁড়িয়ে আছে মিতিনমাসির সঙ্গে। এই তাতেপোড়া দুপুরেও ট্রেনযাত্রীর কমতি নেই, অনেকেই অপেক্ষা করছে ট্রেনের।

টুপুরের একটু তেষ্টা তেষ্টা পাচ্ছিল। এদিক-ওদিক কোনও ডাবওয়ালা আছে কিনা দেখতে গিয়ে হঠাৎই দৃষ্টি স্থির। প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে কে ও? ইতিউতি তাকায়? সান্যালবাড়ির সেই অভদ্র লোকটা না? পলকের জন্য দর্শন দিয়েই সাঁত করে সরে গেল কোথায়! কোনও দোকানের আড়ালে ঘাপটি মারল কি?

মিতিনমাসির হাত চেপে ধরেছে টুপুর। অস্ফুটে বলল, "ওদিকে দ্যাখো!"

চোখে সানগ্লাস চড়ানো মিতিনের স্বর নির্বিকার, "দেখেছি। আর ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাস না।"

"লোকটা কি আমাদের ফলো করে এল?"

"রোদ্দুরে নিশ্চয়ই বেড়াতে বেরোয়নি!"

টুপুরের মুখে আর কথা ফুটছে না। ভিতরটা উত্তেজনায় টগবগ করছে। ষণ্ডামার্কা লোকটার কী মতলব আছে রে বাবা? নীলাম্বর যদি সত্যিই খুন হয়ে থাকে, আর মল্লিকপুরের সান্যালবাড়ির সঙ্গে তার কোনও যোগসূত্র থাকে, তা হলে তো আরও সাবধান হওয়া উচিত মিতিনমাসির।

ট্রেন ঢুকছে। কামরায় ওঠার আগে তাকাব না তাকাব না করেও টুপুরের চোখ ঘুরে গেল। সর্বনাশ, যা ভেবেছে তাই! লোকটা বেরিয়ে এসেছে আড়াল থেকে! ট্রেনে চড়তে গিয়েও কী ভেবে

যেন উঠল না। দাঁড়িয়ে গিয়েছে দরজার সামনে। যাক নিশ্চিন্ত, এখনই এখনই তা হলে বিপদের আশঙ্কা নেই।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই মিতিনমাসি হাত ধরে টানল, "নেমে পড়।"

"কেন?"

"আবার মল্লিকপুরে ফিরব।"

আবার সেই এঁদো ডোবা। আবার সেই ভারী গেট। আবার সেই জরাজীর্ণ সান্যালবাড়ি। সময়টাই শুধু দুপুর থেকে বিকেলের দিকে গড়িয়েছে, এই যা। উঁহুঁ, আরও একটা তফাত হয়েছে। একখানা মোটরবাইক দাঁড়িয়ে বাড়িটার ভিতরে। আমগাছতলায়।

এবার আর বারান্দায় উঠে ডোরবেল খুঁজল না মিতিন। গুমগুম ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়।

একতলার একটা জানলার খড়খড়ি ফাঁক হল। চেনা রুক্ষ গলা, "কে?"

"আমরা। তখন এসেছিলাম।"

"আবার কী হল?"

"সুধন্যবাবুকে একটা জিনিস দেওয়ার ছিল।"

"দাঁড়ান। আসছি।"

মিনিটদুয়েক পর দরজা খুলল। এখন আর লুঙ্গি-পাঞ্জাবি নয়, লোকটার পরনে ট্রাউজ়ার আর টি-শার্ট। স্টেশন থেকে ফিরে এখনও পোশাক বদলায়নি। দু'হাতে দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

কর্কশ গলায় বলল, "কী, দেবেনটা কী? বারবার এসে বিরক্ত করছেন কেন?"

"দাঁড়ান না একটু, দিচ্ছি।" মিতিন ধীরেসুস্থে ভ্যানিটি ব্যাগের চেন খুলল। এবং তারপরই যে বস্তুটি বের করল, তার জন্য লোকটা কণামাত্র প্রস্তুত ছিল না। টুপুরও নয়।

আস্ত একখানা রিভলভার!

সেকেন্ডের মধ্যে সেফটি ক্যাচ খুলে মিতিন রিভলভারের নল ঢুকিয়ে দিয়েছে লোকটার নাকের ফুটোয়। তীক্ষ্ণ স্বরে হিসহিসিয়ে উঠল, "এক চুল নড়লে গুলি চালিয়ে দেব।"

আতঙ্কে চোখ প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে এল লোকটার। ঘড়ঘড় করছে গলা। ঘামছে দরদর।

রিভলভার দিয়েই লোকটাকে ঠেলল মিতিন, "চলুন, ভিতরে চলুন। উঁহু, ঘোরার চেষ্টা নয়। পিছন দিকেই হাঁটুন।"

অগোছালো বসার ঘরের মাঝখানে এসে মিতিন পলকে চোখ বুলিয়ে নিল চারদিকে। জিজ্ঞেস করল, "টেলিফোন কোথায়?"

কাঁপতে-কাঁপতে লোকটা বলল, "দো-দো-দো-দোতলায়।"

"টুপুর, আমার ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের কর তো।"

মিতিনমাসির দাপট দেখে টুপুরের বুকেও বল এসে গিয়েছে সহসা। দ্রুত খুদে যন্ত্রখানা তুলে নিয়ে এগিয়ে দিয়েছে।

ওই এগিয়ে দেওয়া আর মিতিনের ঝলক ঘুরে তাকানো — দুইয়ের মধ্যে যেটুকু সময়, তার ফাঁকেই লোকটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে মিতিনকে। হিংস্র বুনো ভল্লুকের মতো হাঁ হাঁ করে ধেয়ে এল সঙ্গেসঙ্গে।

পর মুহূর্তেই যা ঘটল, টুপুর জীবনেও ভুলবে না। কাঁধের ওড়না ফেলে দিয়ে ভল্ট খেয়ে উঠে দাঁড়াল মিতিনমাসি। বিদ্যুৎবেগে সরে গেল খানিকটা। তারপর বিকট চিৎকার হেনে জোর এক লাফ। এবং

লোকটার বুকে সপাটে জোড়া পায়ের লাথি। কী সাংঘাতিক জোর ওই পদাঘাতের, বাপ্‌স! কাটা কলাগাছের মতো লোকটা ধরাশায়ী!

ত্বরিত গতিতে লোকটার বুকে হাঁটু চেপে মিতিনের রিভলভার এবার লোকটার রগে, "কী, ট্রিগার টিপব?"

লোকটা অসহায়ভাবে মাথা ঝাঁকাল, "আমি কিছু জানি না। আমায় ছেড়ে দিন।"

"কোনও চালাকি নয়। উঠে বসুন। ফোনে বাসন্তীতে কথা বলুন এখনই। আপনার বসের সঙ্গে।"

"কে কে কে..কে বস?"

"ন্যাকা সাজা হচ্ছে? যা যা বলছি, অবিকল সেই কথাগুলো বলবেন। একটা শব্দ এদিক-ওদিক হলে কিন্তু নীলাম্বরের চেয়েও বিচ্ছিরিভাবে মরতে হবে। আমি কিন্তু ঘিলু ছেতরে দেব।"

"কী কী কী কী বলব?" লোকটা কাঁপছে।

"বলছি। মন দিয়ে শুনুন। ... বলবেন, হাওয়া খুব গরম। মেয়ে টিকটিকিটা সব আঁচ করে ফেলেছে। মাল আর এখানে রাখা সম্ভব নয়, আজই পাচার করা দরকার। আপনি যে করে হোক এখনই চলে আসুন। আমি আর-একবার বাইকে চেপে বাইরের হাওয়া দেখে আসছি। তেমন বুঝলে আপনাকে আবার ফোন করব।"

"অ্যা অ্যা অ্যা অ্যাত কথা ...?"

"হ্যাঁ। গলা যেন একটুও না কাঁপে। বলতে পারলে নীলাম্বর হত্যায় রাজসাক্ষী হওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। না পারলে আজই জীবনের ইতি।" বলেই মিতিন ঘুরেছে টুপুরের দিকে, "মোবাইলে সুমন্ত্র সান্যালের নম্বরটা ধর তো। প্রথমে বাসন্তীর এস টি ডি কোড। জিরো থ্রি টু ওয়ান এইট থ্রি টু ..."

রিং বাজতেই টুপুর মোবাইল চেপেছে লোকটার কানে। বীরদর্পে বলল, "নিন, কথা বলুন।"

লোকটা কোনওক্রমে আওড়াচ্ছে শেখানো বাক্যগুলো। ওপারের মানুষটার স্বর চড়ছে ক্রমশ। প্রায় নিঃশব্দ ঘরে তার সংলাপও স্পষ্ট শোনা যায়। ডক্টর সান্যালের মতো সৌম্য শান্ত ভদ্রলোকের মুখে এ কী ভাষা? '... শয়তান মেয়ে টিকটিকিটাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের তলায় ফেলে দিসনি কেন! দাঁড়া, আজকের ঝামেলা মিটুক, ডিটেকটিভকেও আমি নীলাম্বর আর ডোবারম্যানটার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি! আসছি আমি। যত তাড়াতাড়ি পারি পৌঁছোচ্ছি!'

মোবাইলের সুইচ অফ করে দিল টুপুর।

মিতিন কড়া গলায় বলল, "এবার উঠে দাঁড়ান। কোনও বেগড়বাঁই না করে দোতলায় চলুন। যেখানে টেলিফোন আছে, সেখানে বসে থাকবেন চুপটি করে। আর আপনার বসের ফোন এলে ধরবেন।"

লোকটা বুঝে গিয়েছে আর তার রক্ষা নেই। অগত্যা বেজার মুখে যন্ত্রচালিত রোবটের মতো উঠল সিঁড়ি বেয়ে। মিতিন অবশ্য রিভলভার ঠেকিয়ে রেখেছে তার শিরদাঁড়ায়। দোতলার বড় প্যাসেজে খানতিনেক ছেঁড়াখোঁড়া সোফা, মাঝে কাচের টেবিল। টেলিফোন টেবিলেই শোভা পাচ্ছিল। ধপ করে সোফায় শরীর ছেড়ে দিল লোকটা। হাঁপাচ্ছে।

রিভলভার উঁচিয়ে রেখে মিতিন বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল, "এবার বলুন, আপনাদের মালটা কোথায় রাখা আছে?"

লোকটার গলায় আর স্বর নেই। চোখের ইশারায় বাঁ দিকের বন্ধ ঘরটা দেখাল।

মিতিন টুপুরকে বলল, "যা, ও ঘরে উঁকি দিয়ে আয়। নয়ন সার্থক হবে।"

টুপুর উৎসুক পায়ে গিয়েছে ঘরের সামনে। ঠেলে দরজা খুলতেই দু'চোখ বিস্ফারিত। এ কী দৃশ্য? এও কি সম্ভব?

ডক্টর সুমন্ত্র সান্যাল স্বয়ং ঘুমোচ্ছেন বিছানায়!

মল্লিকপুরে ফের এসে প্রথমে অনিশ্চয় মজুমদারকে ফোন করেছিল মিতিন। খোদ আই জি সাহেবের নির্দেশ পেয়ে স্থানীয় থানার ও সি দেরি করেননি, পৌনে পাঁচটার মধ্যে সদলবলে হাজির। একটা মুশকো শয়তানকে মিতিন একাই কবজা করেছে দেখে তাঁর তো চোখ কপালে। পরক্ষণেই অবশ্য অনুযোগ জানালেন, এত বড় ঝুঁকি নেওয়া নাকি ঠিক হয়নি। পুলিশবাহিনীর জন্য মিতিনের অপেক্ষা করা উচিত ছিল। বাড়িতে বজ্জাতটার আরও সঙ্গীসাথীও তো থাকতে পারত।

মিতিন আশঙ্কাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিল। সান্যালবাড়িতে প্রথমবার এসেই সে বুঝে ফেলেছে, এখানে পাজি লোকটার কোনও দোসর নেই। বাসন্তী থেকে কর্তার হুকুম পেয়ে সে মোটরবাইক নিয়ে স্টেশন অবধি ছুটেছিল বটে, কিন্তু বাড়ি ফাঁকা বলেই বেচারা ট্রেনে উঠে মিতিনদের অনুসরণ করতে পারেনি। তাকে ফিরতে হয়েছে সান্যালবাড়ির গুহায়। তা ছাড়া চেহারা যতই জবরদস্ত হোক, মিতিনের ধারণা লোকটা আদতে রামভিতু।

টুপুর মনেমনে হাসছিল। মিতিনমাসির স্বভাবটাই এরকম। কখনওই নিজেকে জাহির করতে চায় না। সে তো দেখেছে, কীভাবে মিতিনমাসি কুংফুর দক্ষতায় অবলীলায় পটকে দিল লোকটাকে। থাক সে কাহিনী, শুনে ও সি সাহেব হয়তো ভিরমি খাবেন!

লোকটাকে পুলিশের হাতে সঁপে দিয়ে মিতিন এখন অনেকটা ঝাড়া হাত-পা। মোবাইলে বাড়িতে ফোন করল একবার। জেনে নিল বুমবুম কী করছে। পেট ভরে বুমবুমকে পাস্তা খাইয়ে দিতে বলল ভারতীকে। রাতের রান্না নিয়েও নির্দেশ দিল টুকিটাকি। তারপর উর্দিধারীদের খানিকটা আড়ালে আবডালে থাকতে বলে টুপুরকে নিয়ে সোজা মোড়ের চায়ের দোকানে।

সান্যালবাড়িতে পুলিশ দেখে দোকানে জল্পনাকল্পনা চলছিল

জোর। দুপুরের লোকটা হাত-মুখ নেড়ে খদ্দেরদের বলছিল কী সব, মিতিনদের দেখে থমকে গেল। অবাক হয়ে বলল, "একী, আপনারা তখন যাননি?"

টুপুর বুঝল, দ্বিতীয়বার রিকশায় সোজা সান্যালবাড়ি চলে গিয়েছিল বলে দোকানদারটি তাদের খেয়াল করেনি। মিতিনের পাশে বেঞ্চিতে বসে বলল, "না। দরকারে পড়ে ফিরতে হল।"

টুপুরের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মিতিন বলল, "স্টেশনে গিয়ে বাসন্তীতে ফোন করেছিলাম। স্যার জানালেন, উনি আজই আপনাদের সোনাদাকে রিমুভ করতে আসবেন। তাই আমরাও রয়ে গেলাম। যদি স্যারের কাজে লাগি।"

এক কৌতূহলী ভদ্রলোক চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু সান্যালবাড়িতে পুলিশ এসেছে কেন?"

"সোনাবাবুর বন্ধুটি নাকি সুবিধের নয়।" মিতিন চোখ ঘোরাল, "একটা কুকুর আর একটা মানুষকে মার্ডার করে এখানে ঘাপটি মেরে ছিল।"

"ছি ছি, কী সব বন্ধুর সঙ্গে মেশে সোনা! একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে।"

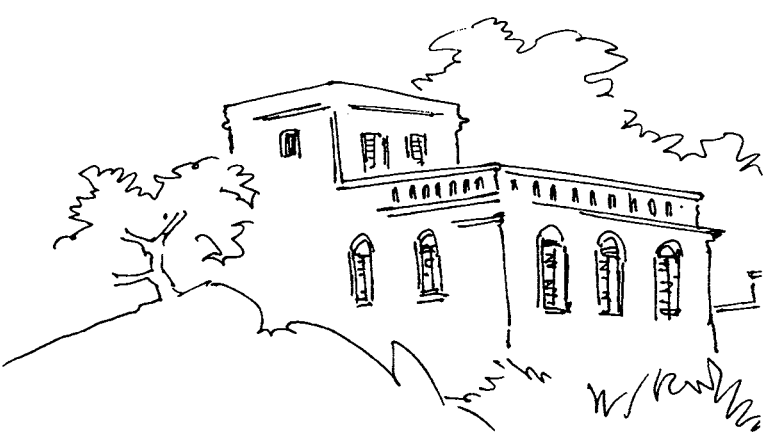

"আর এই জন্যই তো সোনাদার এই হাল।" অন্য এক খদ্দের বলল, "সাধে কি বলে সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ!"

মিতিন প্রসঙ্গটায় আর ঢুকলই না। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "কিছু খাবার হবে ভাই?"

দোকানি শশব্যস্ত, "ঘুগনি বানিয়েছি। টোস্ট-অমলেটও হতে পারে। কিংবা টিফিনকেক।"

"ঘুগনিই দিন দু'প্লেট। সঙ্গে দুটো লিকার চা। ... কী রে টুপুর, আজ তোর একটু চা চলবে তো?"

টুপুর লাজুক মুখে বলল, "খাই একদিন।"

"অমলেটও নিতে পারিস সঙ্গে। পেটটা ভরা থাক। আরও ঘণ্টা তিন-চার হয়তো এখানে কাটাতে হবে।"

অতক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হল না অবশ্য। সান্যালবাড়িতে ফিরে একতলার ঘরে বসে ও সি'-কে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত শোনাচ্ছিল মিতিন, পৌনে আটটা নাগাদ বাইরে গাড়ির শব্দ। অ্যাম্বাসাডর।

টুপুরের স্নায়ু টানটান। না জানি কী হয় এবার!

বাসন্তীর দীর্ঘদেহী মানুষটি দরজা ঠেলে ঢুকলেন ঘরে। সঙ্গেসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে মিতিন। দু'হাত ছড়িয়ে বলল, "ওয়েলকাম হোম

সুধন্যবাবু। আপনার বাকি দুই চ্যালা কি গাড়িতে? তাদের বলে দিন, ভাড়া করা গাড়িটি আর লাগবে না। মহামান্য সরকারবাহাদুরের ব্লু মারিয়া আপনাদের পথ চেয়ে আছে।"

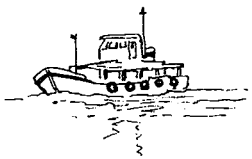

বাসন্তীতে ডক্টর সুমন্ত্র সান্যালের বাড়ি আজ জমজমাট। মিতিন, পার্থ, টুপুরের সঙ্গে বুমবুমও এসেছে। অনিশ্চয় মজুমদারও। রতন হেনরি মণ্ডল এখন দেখাশোনা করছে সুমন্ত্র সান্যালের। বুমবুম তার লেজ ধরে সর্পগৃহ দেখতে গিয়েছিল। দর্শন সেরে সে ছুটে বেড়াচ্ছে গোটা কম্পাউন্ডে। আই জি সাহেবের আগমনবার্তা পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাসন্তী থানার ও সি'ও হাজির। মঙ্গলও আজ রয়েছে বাড়িতে।

ডক্টর সান্যাল এখন অনেকটাই সুস্থ। মল্লিকপুর থেকে উদ্ধার করে তাঁকে দিনকয়েকের জন্য রাখা হয়েছিল কলকাতার এক নার্সিং হোমে, বাসন্তী ফিরেছেন সবে পরশু। টানা আট-ন'দিন কোকেন ইঞ্জেকশন পড়ার প্রতিক্রিয়া তাঁর স্নায়ু থেকে কেটেছে বটে, আচ্ছন্ন ভাবটাও আর নেই। তবে এখনও তিনি বেশ দুর্বল। হাঁটাচলা যতটুকু করছেন, রতনের কাঁধে ভর রেখে। তাঁরই আন্তরিক আমন্ত্রণে আজ এই সমাগম।

বাইরের ঘরে বসে কথাবার্তা চলছিল। চা, মিষ্টি হয়ে গিয়েছে এক প্রস্থ, রতন দ্বিতীয় রাউন্ডে কফি দিয়ে গেল। কাপ হাতে নিয়ে অনিশ্চয় জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা ম্যাডাম, শুধু রিগর মর্টিস সেট ইন করার টাইমের সূত্র ধরেই আপনি বুঝে ফেলেছিলেন নীলাম্বর খুন হয়েছে?"

পার্থ বলে উঠল, "সঙ্গে সাপের কামড়ের দাগগুলোও আছে। ইঞ্জেকশনের চিহ্ন আর সাপের দাঁতের দাগ নিশ্চয়ই এক রকম হবে না?"

মিতিন বলল, "হ্যাঁ, ওটাও একটা যুক্তি বটে। ক্ষতস্থানটাও আমার কেমন কেমন যেন লেগেছিল! পরে বই দেখে জানলাম, রাসেল ভাইপার, মানে চন্দ্রবোড়া, পুরো বিষ ঢাললে চামড়া সামান্য হলেও ছিঁড়ে যায়। নীলাম্বরের গোড়ালিতে দুটো বড় বড় ফুটো ছিল বটে, জায়গাটা ফুলেও গিয়েছিল, কিন্তু চামড়া ছিল ইনট্যাক্ট। এ ছাড়া কিন্তু ছোট দাগ, মানে বিষদাঁত ছাড়া বাকি দাঁতের কোনও চিহ্নই ছিল না। অবশ্য বাকি দাঁতের দাগ সবসময় যে পড়বেই তার কোনো মানে নেই।"

মঙ্গল মন দিয়ে শুনছিল। ধরাধরা গলায় বলল, "আমারও কিন্তু একটু একটু সংশয় জেগেছিল। মনে হচ্ছিল, সাপ পুরো ছোবল মারতে পারেনি। গরমকালে সাপের বিষ পাতলা থাকে। পুরো বিষ না ঢেলে থাকলে নীলু অত তাড়াতাড়ি মরে কী করে?"

"হুঁ। তবে এত সূক্ষ্ম জ্ঞান তখনও আমার ছিল না। আমি খুনের ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত হয়েছিলাম অন্য একটা ব্যাপার থেকে। ডেডবডির পকেটে কোনও চাবি ছিল না।"

অনিশ্চয় বিস্মিত স্বরে বললেন, "মানে?"

"ডক্টর সান্যালের বাড়ির গেট সবসময় তালাবন্ধ থাকে। নীলাম্বর রাতেই বেরোক, কি ভোরে, সে নিশ্চয়ই তালা খুলে বেরিয়েছে। অতএব চাবিটি তার পকেটেই থাকার কথা। ছিল কি?"

ও সি বললেন, "না। আমরা ডেডবডির পকেট ভালভাবে সার্চ করেছি। কিচ্ছু ছিল না। ডেডবডির আশেপাশেও কিছু পাওয়া যায়নি।"

"তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? নীলাম্বর তালা খুলে বেরোয়নি, অথচ বডি বাইরে পড়ে ছিল! খুন ছাড়া আর কী হতে পারে? এবং সেটা হয়েছে বাড়ির ভিতরেই। তারপর খুনি তালা খুলে বডি সরিয়েছে। তবে সত্যি বলতে কী, খুনের চেষ্টা আগের রাত্তিরেই হয়েছিল। একা সুধন্যই সাপের বিষ ইনজেক্ট করতে ঢুকেছিলেন নীলাম্বরের ঘরে। কিন্তু নীলাম্বর জেগে গিয়ে চোর এসেছে ভেবে হল্লাগুল্লা শুরু করায় সুধন্যর মতলবটি কেঁচে যায়। এদিকে নীলাম্বরকে বাঁচিয়ে রাখাও সুধন্যর পক্ষে বিপজ্জনক। যদি নীলাম্বর তাকে চিনে ফেলে? যে-উদ্দেশ্যে তাঁর সুমন্ত্রর বেশ ধারণ, নীলাম্বর উপস্থিত থাকলে তাতেও তো পদেপদে বিঘ্ন!"

পার্থ বলল, "আমার মনে হয় সুধন্য যে সুমন্ত্র নন, এ ধারণা নীলাম্বরের মাথায় এসেওছিল। আঁচ পেয়ে তাই তাকে তড়িঘড়ি ..."

"হতেই পারে।" মিতিন মাথা নাড়ল, "হতে পারে সুধন্যর কোনও ফোনাফুনি শুনে ফেলেছিল নীলাম্বর। ওদিকে তখন অন্য একটা বখেড়াও এসে পড়েছে। পরদিন থেকে বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসার কথা। চোরের উপদ্রবের জন্য। তাই খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই চ্যালাচামুণ্ডাদের ডেকে নীলাম্বরকে নিকেশ করা হল। চ্যালাদের সাহায্যে ক্লোরোফর্মটোরোফর্ম দিয়ে আগেই অজ্ঞান করে মেপেজুপে ভেনাম পুশ। তারপর চ্যালাদের মাধ্যমেই বডি পাচার।"

পার্থ বলল, "কিন্তু শাগরেদরা এল কখন?"

"বিকেল বা সন্ধেতে এলে নীলাম্বর নিশ্চয়ই তাদের দেখেছে। তবে সেটা নিশ্চিতভাবে জানা তো এখন আর সম্ভব নয়।" মিতিন কফি শেষ করে কাপ নামাল, "আমার ধারণা, নীলাম্বর তাদের বিকেল-সন্ধেতে দ্যাখেনি। কারণ তারা এসেছিল রাতে।"

"কী করে হয়? রাতে তো ফেরিঘাট বন্ধ থাকে?"

"রাস্তা হাজার একটা আছে মশাই। গোসাবা দিয়েও বাসন্তীতে আসা যায়। সেখানকার ফেরিঘাট এই বাড়ি থেকে অনেকটাই দূরে। ওই ঘাটে সন্ধেয় এসে, জিরিয়েটিরিয়ে রাত বাড়লে হয়তো রওনা হয়েছে। সোনাখালি থেকে প্রাইভেট নৌকো ভাড়া নিয়ে, যেখানটা নীলাম্বর পড়ে ছিল, সেখানে এসে নামলেও জানছেই বা কে, দেখছেই বা কে! তারপর রজারকে মারার জন্য যেভাবে কম্পাউন্ডে ঢুকেছিল, সেভাবেই পাঁচিল টপকে গৃহে প্রবেশ।"

"হ্যাঁ। আমার রজারকে ওরাই মেরেছিল।" ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত সুমন্ত্রর ক্ষীণ স্বর শোনা গেল, "মল্লিকপুরে আমাকে ওরা ভয় দেখিয়ে বলত, রিভলভারে সাইলেন্সার লাগিয়ে মেরে রজারকে যেমন জলে ভাসিয়ে দিয়েছি, আপনাকেও সেভাবে..."

"পাষণ্ডের দল।" পার্থ গজগজ করে উঠল, "অনিশ্চয়বাবু, ওরা তো এখন পুলিশ হাজতে। রোজ ওদের একশো ঘা করে বেত মারা যায় না?"

মিতিন বলল, "আহা, বেচারাদের আর উপায়ই বা কী ছিল! রজারকে না সরালে সুমন্ত্রবাবুর জায়গায় সুধন্যবাবু ঢুকবেন কী করে! দু'জনে যমজ ভাই ঠিকই, দেখতেও হুবহু এক। তবে মানুষ ধোঁকা খেতে পারে, কুকুর তো আসল লোক চিনতে এক সেকেন্ডও সময় নেবে না।"

টুপুর বলল, "সত্যি, যমজ ভাইদের চেহারায় এত মিল আমি জন্মে দেখিনি।"

"হয় রে, হয়। অনেক হয়। হয়তো একটু ডিফারেন্স থাকে। হয়তো হাইটে হাফ ইঞ্চি কম-বেশি, কিংবা ভুরু অন্যরকম। অথবা নাকে স্লাইট তফাত। পাশাপাশি দু'জনকে একসঙ্গে না দেখলে ওটুকু ধরাই যাবে না।"

"আমাদের মধ্যেও আছে।" সুমন্ত্র বললেন, "চোখের মণিতে।"

"জানি। আপনার মণি কালো। আর আপনার ভাইয়ের চোখ কটা। সুধন্যবাবু কনট্যাক্ট লেন্স পরে সেটা সহজেই ম্যানেজ করেছিলেন।"

পার্থ ভুরু কুঁচকোল, "তুমি আই-বলের ব্যাপারটা জানলে কী করে?"

"দেবেশ সেনের কল্যাণে। দেবেশবাবুর মুখে গল্প শুনে হঠাৎই রাতে মাথায় স্ট্রাইক করল, দু'ভাই বোধহয় যমজ। নইলে একজন যখন বি এসসি ফাইনাল ইয়ারে, অন্যজনের তখন মেডিক্যাল থার্ড ইয়ার? রাতে ফোন লাগাতেই রহস্য জলবৎ তরলং। চোখের কালারের ডিফারেন্সটাও জেনে গেলাম।"

"আর-একটা চিহ্নও ছিল আমাদের চেনার।" সুমন্ত্র চোখ বুজলেন, "আমার কাঁধে জড়ুল আছে, সোনার নেই।"

অনিশ্চয় বললেন, "আপনাদের মধ্যে আরও অনেক তফাত আছে ডক্টর সান্যাল। আপনাদের দু'জনের ক্যারেক্টারটাই একদম আলাদা। আপনি সৎ, বিদ্বান, দেশপ্রেমিক। আর আপনার ভাই লোভী, শঠ, নেশাখোর। আপনার উপর তার টানও নেই। নইলে লোভে পড়ে আপনার সঙ্গে এই ভয়ংকর নিষ্ঠুর আচরণ করে!"

"সোনা কিন্তু চিরকাল এমনটা ছিল না, জানেন আই জি সাহেব।" সুমন্ত্র পূর্ণ চোখে তাকালেন। ভেজাভেজা স্বরে বললেন, "ডাক্তারি পড়তে যাওয়াটাই ওর কাল হল। বিশ্বাস করুন, ওকে সুপথে আনার কম চেষ্টা করিনি। ওর জন্য আমার বাবা-মাও জ্বলেপুড়ে মরেছেন! বিদেশে থাকতেই এখানকার এক বন্ধুকে ধরেকরে বাঙ্গালোরে সোনার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কোম্পানির টাকাপয়সা হাতিয়ে চম্পট দিল। এই বাসন্তীতে এসে আমি যখন কাজ শুরু করলাম, ওকে আবার সুযোগ দিলাম একটা। আমার সঙ্গেই থাকুক। পেটে মেডিক্যাল লাইনের বিদ্যে আছে তো, সাহায্য করুক আমার কাজে। কীসের কী! সে আমার সাপের বিষ

কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বেচা শুরু করে দিল। কী দাম ওই সব বিষের! পাঁচ হাজার টাকা, ছ'হাজার টাকা ভরি। শুধু তাই নয়, বিষ চুরি হলে আমার গবেষণাও তো চৌপাট। বাধ্য হয়ে বললাম, 'তুই মল্লিকপুরেই ফিরে যা। মাস-মাস গিয়ে টাকা দিয়ে আসব, কিন্তু তুই আর বাসন্তীর ছায়া মাড়াস না।' বুঝতে পারতাম, ভাইটার আরও ক্ষতি করলাম। কোনও কাজকর্ম না করেই হাতে টাকা পেয়ে প্রাণের সুখে নেশা করছে, আর চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে ফূর্তি করছে। মল্লিকপুরের বাড়িটা সারাতে টাকা দিলাম, সেই পয়সাও উবে গেল। আমার স্ত্রী তো ঘূণাক্ষরেও এত সব কথা জানে না। ভাইকে আমিই প্রশ্রয় দিয়েছি জানলে সে যে কী অনর্থ করবে!"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু স্যার, আপনি যে ক্যান্সারের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে ফেলেছেন, এই খবরটি সুধন্যবাবু পেলেন কোত্থেকে?"

"আমি। আমি। আমিই দায়ী।" সুমন্ত্র বড়বড় শ্বাস ফেলছেন, "এত বড় একটা সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছি, আপনজনের কাছে সেই আনন্দটুকু জানাব না? সোনা যে শুনে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, আমি বুঝব কী করে? কী স্পর্ধা ভাবুন, সে আমাকে বলে কিনা, 'ফর্মুলাটা দিয়ে দে! বড় কোনও ওষুধ কোম্পানিতে মোটা টাকায় বেচে তুই আমি দু'জনেই কোটিপতি বনে যাই!' আমি রাজি হইনি বলেই ওর এই চণ্ডমূর্তি।"

"তা স্যার, আপনার কাছে মাসদু'য়েক আগে যে তিনটে লোক এসেছিল, তারা কারা?"

"তারাই তো ওরা। সোনার তিন শাগরেদ। তখন এসে পরিচয় দিয়েছিল ওষুধ কোম্পানির অফিসার বলে। প্রথমে মিষ্টি কথায় লোভ দেখাল, তারপর সরাসরি শাসানি।" সুমন্ত্র যেন সামান্য উত্তেজিত,

"পরে বুঝলাম, সোনাই ওদের সাজিয়েগুজিয়ে পাঠিয়েছিল।"

টুপুর বলল, "তারপরই তো রজারকে সরিয়ে দিল। তাই না স্যার?"

"রজারকে হারিয়ে আমি প্রথমটা বড় বিহ্বল হয়ে পড়ি। সে আমায় বড্ড ভালবাসত।" সুমন্ত্রর গলা প্রায় বুজে এল, "তারপর হঠাৎই কেমন একটা ভয় এসে আমায় আঁকড়ে ধরল। রজারকে কে ইলোপ করল? কেন করল? ঘাবড়ে গিয়ে আই জি সাহেবকে তাই ফোন করেছিলাম। টের পাচ্ছিলাম, যে-কোনও সময় সোনা আমায় আরও কোনও মারাত্মক ফাঁদে ফেলতে পারে।"

মিতিন বলল, "এরপর কী হল আমি বলছি। আপনি যাদবপুরে সেমিনারে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ফোন এল আপনার ভাইয়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ঠিক সেখানে সংবাদ আসেনি, সেমিনার থেকে গেস্টহাউজে গিয়ে আপনি যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখনই পেয়েছিলেন ফোনটা। আপনি ভালমানুষের মতো ছুটলেন মল্লিকপুর। এবং সেখানে গিয়ে বন্দি হয়ে গেলেন।"

অনিশ্চয় জিজ্ঞেস করলেন, "এ তথ্য আপনি পেলেন কোত্থেকে?"

মিতিন বলল, "সুধন্যবাবুই আমায় তথ্যটি জানতে সাহায্য করেছিলেন। প্রথমদিন তিনি বলে ফেলেন, কলকাতায় গেলে সাধারণত সি এস আই আর গেস্টহাউজে থাকেন। ঢাকুরিয়া লেকের ধারে। নিজেকে সুমন্ত্র সান্যাল প্রতিপন্ন করার জন্যই হয়তো ওই বেফাঁস কথাটি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আরও একটা ব্যাপারে তিনি সেদিন বেশ অসতর্ক ছিলেন। রজারকে বারবার 'কুকুর', 'কুকুর' করছিলেন। এতে যে রজারের প্রতি যথেষ্ট অবহেলাই প্রকাশ পায়, সেটা তাঁর খেয়াল ছিল না। সে যাই হোক, সুধন্যবাবুর কাছ থেকে ছোট একটা হিন্ট পেয়েই আমি

লেকের ধারের গেস্টহাউজ়টিতে যাই। এবং রিসেপশনে ফোনের খবরটি জানতে পারি। আরও খবর পাই, পরদিন গেস্টহাউজ়ে গিয়ে সুমন্ত্রবাবু নাকি নিজের ব্রিফকেসটি নিয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ সুমন্ত্রবাবুর ভাইয়ের বানানো ঘাটশিলার গল্পটিও মিথ্যে।

পার্থ বলল, "তার মানে তখনই তুমি বুঝে গিয়েছিলে, সুধন্যবাবু সুমন্ত্র সান্যাল সেজে বাসন্তীতে বসে আছেন?"

"না। গেস্টহাউজ়ে তো গিয়েছিলাম আমি শনিবার। তখনও ভাবছি, ডক্টর সুমন্ত্র সান্যাল বুঝি দু'মুখো মানুষ। তলেতলে কোনও অপকর্ম করে সাক্ষ্য লোপের জন্য নীলাম্বরকে খুন করিয়েছেন। কিন্তু কার্যকারণ সূত্র মিলছিল না। রজারের মৃত্যুটাই গোল পাকিয়ে দিচ্ছিল। ডক্টর সান্যাল রজারকে সরাবেন কেন? তা হলে কি মেঘের আড়ালে কোনও মেঘনাদ আছে? রবিবার দেবেশবাবুর মুখে ডক্টর সান্যালের ভাইয়ের গল্প শুনে ছবিটা অনেক পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর রাত্তিরবেলা ছবিটা তো একদম স্পষ্ট।"

অনিশ্চয় বললেন, "একটাই বাঁচোয়া, আপনি খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছেন। ডক্টর সান্যালকে আরও ক'টা দিন কবজায় রাখতে পারলে সুধন্য তাঁকে পুরোপুরি কোকেনে আসক্ত করে ফেলত। তারপর তিনি যখন নেশার জন্য ছটফট করতেন, কোকেনের সিরিঞ্জ মুখের সামনে নেড়ে পেট থেকে বার করে ফেলত ফর্মুলাটা।"

"না আই জি সাহেব, সেটি বোধহয় পারত না।" সুমন্ত্র মাথা দোলাচ্ছেন, "প্রথমত, কাজটা আমার পুরোপুরি শেষ হয়নি। এখনও একটা-দুটো সিঁড়ি পেরোতে হবে। পরীক্ষা হবে মানুষের শরীরের উপরে। এবং তারপরই এটিকে আমি প্রতিষেধক বলে দাবি করতে পারব। তবে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় যতটা এগিয়েছি তা আমি সিডি করে লুকিয়ে রেখেছি। মরে গেলেও ওই

সিডি আমি সোনার হাতে তুলে দিতাম না। আর সোনাও সারাজীবন এ বাড়িতে মাথা খুঁড়ে সেটি খুঁজে পেত না।"

মিতিন হেসে বলল, "আমি কিন্তু স্যার অনুমান করতে পারছি ওটা কোথায় আছে।"

সুমন্ত্র কষ্ট করেও সোজা হয়ে বসলেন। দম নিয়ে বললেন, "কোথায় বলুন তো?"

"ল্যাবরেটরিতে। আপনি যে নতুন এগজ়স্ট ফ্যান বসিয়েছেন, সেখানেই বোধহয় গোপন গর্ত করে রাখা আছে।"

সুমন্ত্র ফ্যালফ্যাল তাকালেন, "কী করে বুঝলেন?"

"রজারকে হারানোর পরেই আপনার ঘরবাড়ি সারানো, নতুন এগজ়স্ট ফ্যানের ব্যবস্থা, এবং মই কেনা— আইডিয়াটা পেয়েছেন 'মুঘল এ আজ়ম'-এর ক্যাসেট দেখে, তাই না স্যার? আকবর যেভাবে নর্তকী আনারকলিকে দেওয়ালে গেঁথে ফেলেছিলেন, সেভাবেই আপনিও আপনার আবিষ্কারকে ..."

"না না, পুরো বন্ধ করিনি।" এতক্ষণে সুমন্ত্রর ঠোঁটে অনাবিল হাসি, "বক্স বানিয়েছি। উপরে সিমেন্টের ঢাকনাও আছে। দেখে অবশ্য কিছুই বোঝা যাবে না।"

"আবার তা হলে সিডিখানা বের করে নিন স্যার। কাজটা শেষ করে ফেলুন। গোটা পৃথিবীর মানুষ কিন্তু ক্যান্সারের প্রতিষেধকের আশায় দিন গুনছে।"

"দেখি, পারি কিনা।" সুমন্ত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "আমার ভাইটার যে কী হবে!"

ঘরের বাতাস আরও যেন ভারী হয়ে গেল। বাইরেও আজ বড় গুমোট, মেঘ জমছে আকাশে। ডক্টর সান্যালের উদ্বেগটা যেন একটুক্ষণ পাক খেল ঘরে। তারপর বাইরের গুমোটে গিয়ে মিশে গেল।

সুমন্ত্রর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবার ফেরার পালা। বুমবুমকে ডেকে নিয়ে এগোতে শুরু করল সকলে। আগেআগে হাঁটছেন অনিশ্চয়, পাশে বাসন্তী থানার ও সি। পার্থ আর মিতিন তাঁদের পিছনে। সঙ্গে টুপুর, বুমবুম।

রাস্তায় এসে পার্থ তারিফের সুরে বলল, "নাঃ, কেসটা বেশ ইন্টারেস্টিংই ছিল।"

অনিশ্চয় শুনতে পেয়েছেন কথাটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "একটা ব্যাপার আমায় খুব হন্ট করছে, জানেন। প্রায় একই সময়ে একই মায়ের পেটে জন্মে, দুই ভাই সম্পূর্ণ বিপরীত নেচারের হয় কী করে? এ যে দেখি হিন্দি ফিল্‌মের গল্প! এক ভাই ভিলেন হল, এক ভাই হিরো!"

পার্থ বলল, "পরিবেশ একটা ইম্পর্ট্যান্ট রোল প্লে করে, আই জি সাহেব। কুসঙ্গে পড়ে ক্রমশ অবনতি ঘটেছে সুধন্য সান্যালের। শেষ পর্যন্ত সে একটি বিষধর সাপে পরিণত হয়েছে।"

"সাপ কী বলছেন? এ তো সাপের চেয়েও মারাত্মক।"

"হুম। একমাত্র মানুষই বুঝি এত নিষ্ঠুর হতে পারে।"

টুপুর ম্লান গলায় বলল, "ডক্টর সান্যালের কথা ভাবলে আমার খুব খারাপ লাগছে।"

অনিশ্চয় বললেন, "অন্য অ্যাঙ্গল থেকেও ভাবুন। ডক্টর সান্যাল কীভাবে বেঁচে গেলেন! কাজ হাসিল হয়ে গেলে ভাইকে মেরে ফেলতে সুধন্যর মোটেই হাত কাঁপত না।"

"অথচ সব বুঝেও ডক্টর সান্যাল এখনও ওই ভাইয়ের জন্য মন খারাপ করছিলেন।"

"ও ঠিক হয়ে যাবে। কাজকর্মে আবার ডুবে গেলে সামলে যাবেন।"

"এসব ক্ষত কি আর সারে মজুমদারসাহেব?" মিতিন এতক্ষণে

মুখ খুলেছে, "ভাইটিকে ডক্টর সান্যাল সত্যিই বড় ভালবাসেন। সেই ভাই তাঁর সঙ্গে এরকম ...!"

"এর পরও টান থাকলে সেটা কিন্তু অন্ধ ভালবাসা ম্যাডাম। ডক্টর সান্যালের মতো বিজ্ঞানীর কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।" অনিশ্চয় মৃদু হাসলেন, "যাক গে যাক, আপনি এবার একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো ম্যাডাম। সুমন্ত্ররূপী সুধন্য সেদিন রজারের বদলে 'কুকুর' বলেছিল বলেই আপনি আন্দাজ করে ফেললেন ডাল মে কুছ কালা হ্যায়?"

"বললাম তো, ওটা কানে লেগেছিল।" মিতিনের ঠোঁটে রহস্যের হাসি, "সেদিন এ-বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছিলাম মনে আছে?"

"কী বলুন তো?"

"একটা লোকাল ট্রেনের টিকিট। ওই দিনেরই। মল্লিকপুর টু ক্যানিং। ডক্টর সান্যাল তো ফিরেছেন ঘাটশিলা থেকে, ওই টিকিটে তা হলে কে এল? অবশ্য পথচলতি কেউও ফেলে থাকতে পারে। কিন্তু সেটা তা হলে গেটের ভিতর পড়ে কী করে? এবং সেখান থেকেই আমার সন্দেহের শুরু। কেন যেন মনে হয়েছিল, মল্লিকপুরের টিকিট পড়ে থাকাটা কাকতালীয় নয়। বাড়িতেই কেউ এসেছিল। আসলে সুধন্যবাবুই বেখেয়ালে টিকিটটা ..."

টুপুর মুগ্ধ চোখে মিতিনমাসিকে দেখছিল। চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'সত্যি মিতিনমাসি, ইউ আর জিনিয়াস!'

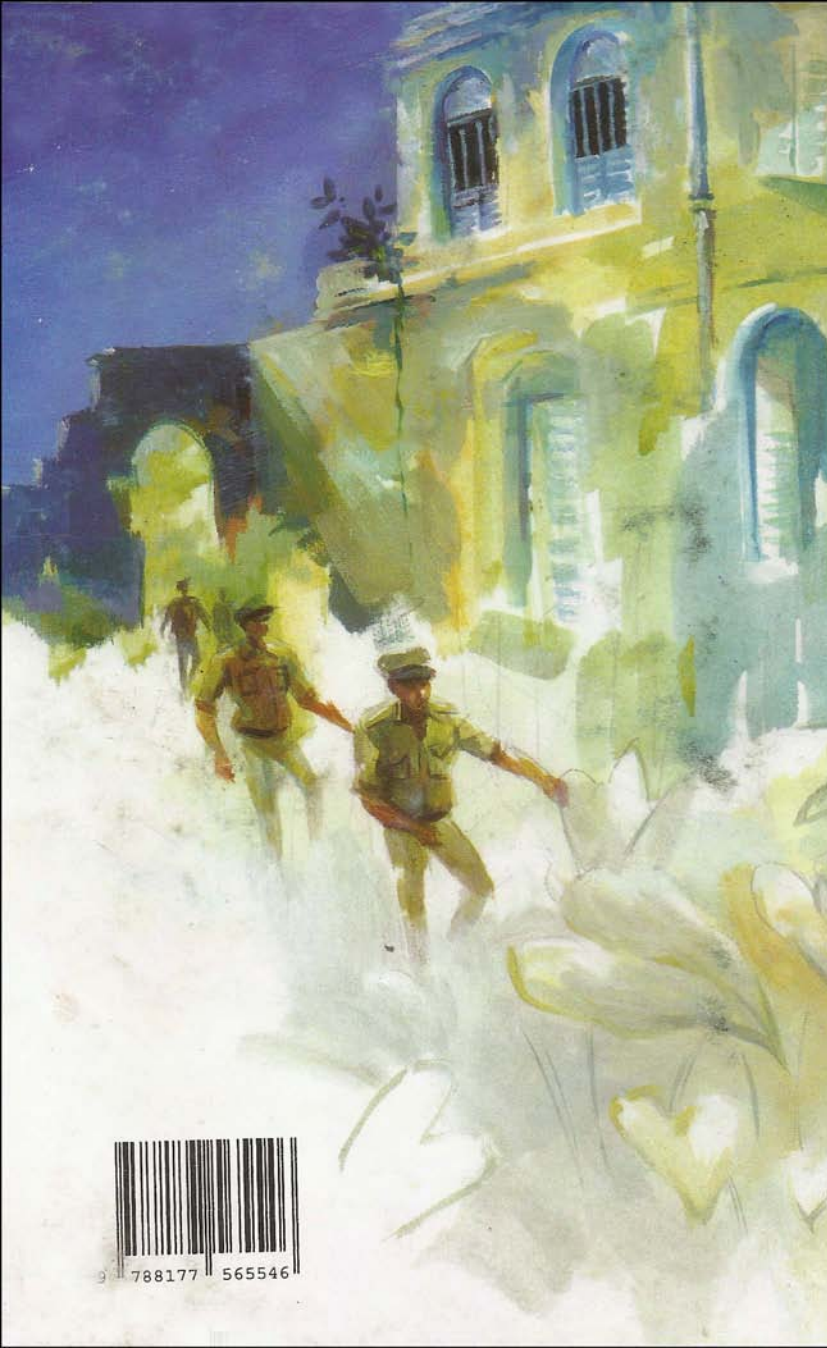

9 788177 565546